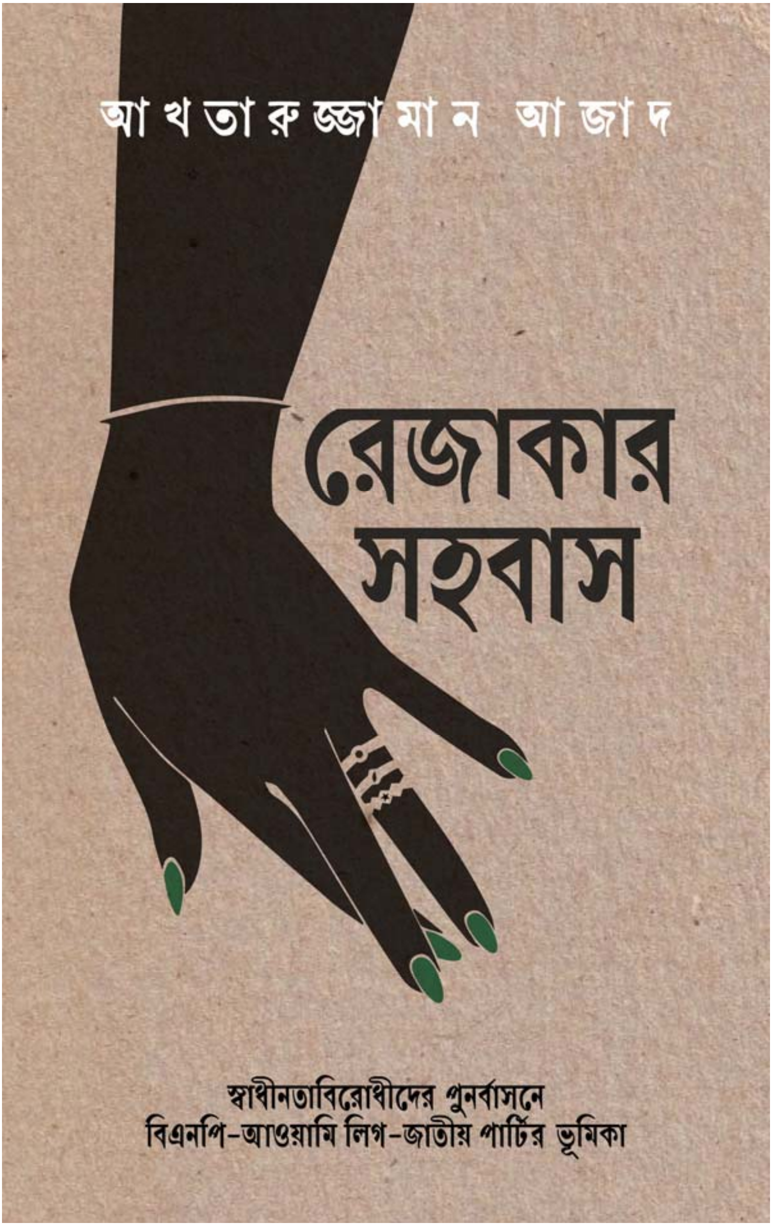
আখতারুজ্জামান আজাদ
রেজাকার সহবাস
স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে
বিএনপি-আওয়ামি লিগ-জাতীয় পার্টির ভূমিকা

রেজাকার সহবাস

আখতারুজ্জামান আজাদ

রেজাকার সহবাস
আখতারুজ্জামান আজাদ

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২৩

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সেলিম হোসেন সাজু

বর্ণবিন্যাস
এনাম রেজা

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
নাজমুল হক ভূঁইয়া রাজীব ও হাসান মোরশেদ

যোগাযোগ
akhtaruzzamanazad.law@gmail.com

উ ৎ স র্গ

মোহাম্মদ আরিফুল হাসান চৌধুরী
কৃষ্ণনগর, কুমিল্লা

এই বইয়ের বানান-নীতি

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

যারা আমার লেখার সাথে পরিচিত নন, এই বইয়ে ব্যবহৃত কিছু-কিছু বানান দেখে তারা নির্ঘাত আঁতকে উঠবেন। ঐ বানানগুলো হজম করতেও তাদের বেশ কষ্ট হবে। তাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

বিদেশী শব্দে ঈ-কার কিংবা ঈ ব্যবহার না করার বিধান করেছে বাংলা অ্যাকাডেমি। বহুল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু বিদেশী শব্দেও, তাই, আমি ঈ-এর পরিবর্তে ই ব্যবহার করেছি; ঈ-কারের পরিবর্তে ব্যবহার করেছি ই-কার। এই বইয়ে ইদ, ইমান, ইশপ, ইগল ইত্যাদি বানান দেখা যাবে। বিদেশী শব্দ বলে শহিদ, মুনশি, আসামি, ইসলামি, বাদি, বিবাদি, কাজি, হাজি, নবি, দেওয়ানি, ফৌজদারি, সুপ্রিম, স্পিকার, আপিল ইত্যাদি বানানে দেখা যাবে ই-কার। এ ক্ষেত্রে স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নামকে বাংলা অ্যাকাডেমি ছাড় দিলেও আমি দিইনি। মুনশিগঞ্জ, ফেনি, গাজিপুর ও রাজশাহি বানানে আমি ই-কার ব্যবহার করেছি; ই-কার ব্যবহার করেছি এমনকি আওয়ামি লিগ, ছাত্রলিগ, জাহাঙ্গিরনগর, পুবালি ব্যাংক, রুপালি ব্যাংক, সোনালি ব্যাংক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও। উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু দন্ত্য স-এর ওপর আমি অস্ত্রোপচার করেছি। এই বইয়ে শাদা, হিশেব, জিনিশ, খালাশ, শাগরেদ, ইশু, টিশু, শবজি, ইনশিওরেন্স ইত্যাদি বানান দেখা যাবে। নিষ্প্রয়োজন বিধায় ভেনু, মেনু, ইশু, টিশু, ট্রাইবুনাল থেকে য-ফলা ছেঁটে ফেলেছি।

কিছু দেশ ও শহরের নামে স্পেস থাকলেও বাংলায় লেখার সময়ে কেন যেন স্পেস দেওয়া হয় না। দেশ ও শহরের নামে আমি যথাযথ ক্ষেত্রে স্পেস ব্যবহার করেছি। শ্রী লঙ্কা, নিউ জিল্যান্ড, পাপুয়া নিউ গিনি ইত্যাদি দেশের নামে এবং নিউ ইয়র্ক, কেপ টাউন, কুয়ালা লামপুর, হং কং, লা পাজ ইত্যাদি শহরের নামে স্পেস রাখা কর্তব্য। দেশের নামের বঙ্গানুবাদ অপ্রয়োজনীয় বিধায় আমি

যুক্তরাষ্ট্রকে বরাবরই ইউএসএ এবং যুক্তরাজ্যকে ইউকে বা ব্রিটেন লিখি। মিশরকে ইজিপ্ট, রাশিয়াকে রাশা, চীনকে চায়না, তুরস্ককে তুর্কিয়ে লেখার চেষ্টা করলেও অনভ্যস্ততাবশত তা পেরে উঠিনি।

যে বানানগুলোকে আমি বর্জন করেছি; এমন না যে, সেগুলো ভুল বা অশুদ্ধ। সেই বানানগুলোকে সংস্কার করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করি। এই নব্য বানানগুলো সর্বজনশিরোধার্য না। এগুলো সবার মানতে হবে– এমনও কথা নেই। মানলে ভালো, না মানলে ক্ষতি নেই। উল্লিখিত বানানগুলোর ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলেই হলো।

সূ চি প ত্র

স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে আওয়ামি লিগের ভূমিকা
০৯

আওয়ামি লিগের জামায়াতভীতি ও জামায়াতপ্রীতি
৩৩

মুক্তিযুদ্ধকালীন এরশাদ, মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী এরশাদ এবং রেজাকার পুনর্বাসন
৪২

বিএনপি স্বাধীনতার কোন পক্ষের দল?
৬৪

মুক্তিযুদ্ধ বনাম স্বাধীনতাযুদ্ধ : দুরভিসন্ধির তিলনকশা
৯৫

আখতারুজ্জামান আজাদ
রেজাকার সহবাস
স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে
বিএনপি-আওয়ামি লিগ-জাতীয় পার্টির ভূমিকা

স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে আওয়ামি লিগের ভূমিকা

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা ছিল মূলত আওয়ামি লিগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির হাতে। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা (জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেনাপ্রধান হিশেবে। ক্ষমতা দখলকালে তাদের কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না, দুজনই রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার পরে। বলাই বাহুল্য– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বা মুক্তিযুদ্ধের আগে জিয়া-এরশাদের রাজনৈতিক দলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তারা কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক ছিলেন না। ফলে, জিয়া-এরশাদ সেনাশাসক হিশেবে বা বিএনপি-জাতীয়পার্টি দলীয়ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে রাজনীতিতে কীভাবে পুনর্বাসিত করেছে, তা হিশাব করা সহজ ও সরলরৈখিক। বলে দিলেই হয়ে যায়– জিয়া-এরশাদ বা বিএনপি-জাতীয়পার্টি অমুক-অমুক স্বাধীনতাবিরোধীকে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে বা দলে পদ দিয়েছে। আওয়ামি লিগ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত বা ২০০৮ থেকে অদ্যাবধি স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে কীভাবে পুনর্বাসিত করেছে, তাও হিশাব করা সহজ। সহজ না আওয়ামি লিগ ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে কীভাবে পুনর্বাসিত করেছে। এই হিশাব মোটেই সরলরৈখিক না, বরং যারপরনাই জটিল ও গোলমেলে। এই গোলমাল রীতিমতো দেশবিভাগের র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মতো। এই গোলমেলে হিশাব কষতে মনস্থির করাটাও অত্যন্ত দুরূহ একটা ব্যাপার।

স্বাধীনতাবিরোধী দল বলতে বর্তমান বাংলাদেশ মূলত জামায়াতে ইসলামিকেই চেনে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড, আমৃত্যু কারাদণ্ড বা নব্বই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে; দু-একজন বাদে তাদের সবাই যেহেতু জামায়াতে ইসলামিরই নেতা ছিলেন, সেজন্যই এই

ধারণার সূত্রপাত– একমাত্র জামায়াতে ইসলামিই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু একই কাজ করেছিল আরো অনেক রাজনৈতিক দল। এদের মধ্যে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লিগের একাধিক শাখা ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি উল্লেখযোগ্য। অবিভক্ত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আওয়ামি লিগেরই অনেক নেতা তা বিশ্বাস করতে পারেননি বা মেনে নিতে পারেননি। ১৯৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের একশো ঊনসত্তর আসনের মধ্যে যে একশো সাতষট্টি আসন আওয়ামি লিগ পেয়েছিল, সেই একশো সাতষট্টিজনের সকলেই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন; তা নয়। তাদের কেউ-কেউ বরং অখণ্ড পাকিস্তানই চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসনক্ষমতার অংশীদার হতে। আওয়ামি লিগের এই একশো সাতষট্টি সাংসদের মধ্যে ক'জন অখণ্ড পাকিস্তান চেয়েছিলেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় ক'জন মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন, ক'জন গণহত্যা সংঘটনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিলেন; এর হদিস এখন আর পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের পরে তাদের কার কী পরিণতি হয়েছিল, তাও বিশদভাবে জানা যায় না। কালের গর্ভে তা গায়েব হয়ে গেছে বা গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। এটুকু জানা যায়– মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দেওয়া আওয়ামি লিগের সাংসদদের সবাইকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকেই সাংসদ হিশেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ১৯৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত অবিভক্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন মুসলিম লিগ-নেতা ডা. আবদুল মুতালিব মালেক। ঐ বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সরকার ডা. মালেককে প্রধান করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য চৌদ্দ সদস্য-বিশিষ্ট একটা মন্ত্রিসভা গঠন করে। সেই মন্ত্রিসভা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কাছে

পদত্যাগপত্র দাখিল করে ১৪ ডিসেম্বর। পদত্যাগের আগ পর্যন্ত তারা গণহত্যা পরিচালনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। আওয়ামি লিগের ঐ একশো সাতষট্টি প্রাদেশিক পরিষদসদস্যের মধ্য থেকে অন্তত দুজন সদস্য মালেক মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। তারা হলেন ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও শামসুল হক। অবশ্য চট্টগ্রামেরই আওয়ামি লিগ-নেতা বখতিয়ারউদ্দিন চৌধুরী দাবি করেছেন– 'চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের অধ্যাপক শামসুল হক আর ফেনীর সাংসদ প্রিন্সিপাল ওবায়দুল্লাহ মজুমদার আওয়ামি লিগের কর্মী ছিলেন না। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক এমএ আজিজের অনুরোধে বঙ্গবন্ধু তাদের মনোনয়ন দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এমএ আজিজকে খুবই স্নেহ করতেন। এমএ আজিজ বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রভাব খাটাতে পারতেন। অধ্যাপক শামসুল হক আর চট্টগ্রামের পটিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ছিলেন এমএ আজিজের ব্যক্তিগত বন্ধু।' (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বাংলা ট্রিবিউন) তবে, উল্লিখিত দুই নেতা যে দলেরই হন না কেন, ইতিহাসে লেখা থাকবে– আওয়ামি লিগের মনোনয়নে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত দুই সাংসদ কুখ্যাত মালেক মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের দালাল আইনে যে সাঁইত্রিশ হাজার স্বাধীনতাবিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদেরও উল্লেখযোগ্য একটা অংশ আওয়ামি লিগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ছিলেন। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ– দালাল আদেশের আওতায় গ্রেপ্তারদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে এই চারটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না, তাদের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান যে 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন; এর পেছনে অসংখ্য কারণ ছিল। বাংলাদেশী দোসরদের বিচার করা হলে পাকিস্তান সরকার একাত্তরে পাকিস্তানে আটকা-পড়া বাঙালিদেরকে ফেরত না দিয়ে বন্দি করে রাখবে, আটকে-পড়াদের মধ্যে যে বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছিলেন– তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে, বাঙালি সেনাকর্মকর্তার মধ্যে যারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলেন– কোর্ট মার্শাল বসিয়ে তাদেরকেও বিচারের আওতায় আনা হবে, 'গুপ্তচরবৃত্তি'র অভিযোগে বিচার করা হবে

দুইশো পাঁচজন বাঙালি সেনাকর্মকর্তার; বাংলাদেশী দোসরদের একাংশের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণার বৃহত্তম কারণ ছিল এটি। আবদুল হামিদ খান ভাসানির দল ন্যাপেরও অনেক নেতাকর্মী মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করে দালাল আইনে গ্রেপ্তার হয়ে কারাভোগ করছিলেন। ফলে, দালাল আইন বাতিলের দাবিতে তিনিও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন, আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছিলেন। আওয়ামি লিগ থেকে বেরিয়ে আসা নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলও (জাসদ) দালাল আইনের বিরোধী ছিল। ওদিকে আওয়ামি লিগের যে নেতারা মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করে দালাল আইনে জেল খাটছিলেন, তাদের মুক্তিযোদ্ধা আত্মীয়স্বজনরাও সরকারের কাছে তদবির চালিয়েছিলেন স্ব-স্ব স্বজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বা শাস্তি কমিয়ে দেওয়ার জন্য। ফলে, 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা ছাড়া ত্যক্তবিরক্ত শেখ মুজিবুর রহমানের আর কিছুই করার ছিল না। ১৯৭৩ সালে 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণার পর আর একজনকেও দালাল আইনে গ্রেপ্তার করা হয়নি। মনে রাখতে হবে– স্বাধীনতাবিরোধীদের জন্য 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণার পেছনে যে একশো একটা কারণ আছে, এর মধ্যে অন্তত একটা কারণ ছিল কিছু আওয়ামি লিগ-নেতার তদবির।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে খোদ শেখ মুজিবুর রহমানও পর্যাপ্ত কঠোর হতে পারেননি বা হননি। মুক্তিযুদ্ধপূর্ববর্তী ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা রাজনৈতিক সহাবস্থানকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি প্রমাণিত যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। প্রত্যেক শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী ব্যক্তিজীবনে ধনাঢ্য হওয়া সত্ত্বেও, দালাল আইনে কারাভোগরত কোনো-কোনো যুদ্ধাপরাধীর পরিবারকে শেখ মুজিবুর রহমান আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্তানের সাবেক স্পিকার মুসলিম লিগ-নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামের শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী। মোহাম্মদ হাসন-সম্পাদিত, ডলফিন প্রকাশন-প্রকাশিত 'ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সমকালীন মুসলিমসমাজ' বই থেকে জেনেছি– 'ফজলুল কাদের চৌধুরী বিচারাধীন বন্দি হিশাবে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালে ১৯৭২ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার ছেলেদেরকে ধানমন্ডি ৩২-এর বাসায় ডেকে নিয়ে

গিয়ে সস্নেহ প্রবোধ বাক্য সহকারে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন, এমনকি টাকাপয়সার প্রয়োজন হলে চাইতেও বলেন।' শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে ফজলুল কাদেরের মেজো ছেলে সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন– 'আমরা মাঝে-মাঝে তার কাছে যেতাম। ইদের সময়ে তিনি টাকা দিয়ে বলতেন কোরবানি দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় গরুটা কিনবি। তার কলিজাটা ছিল এত বড়। আমাদের শরীরে তো মুসলিম লিগের রক্ত, তাই শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়।' (সূত্র– বেলা-অবেলা, মহিউদ্দিন আহমদ)

আবদুল হামিদ খান ভাসানির দল ন্যাপের শীর্ষ স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন মশিউর রহমান জাদু মিয়া। জাদু মিয়ার বড়ভাই সিধু মিয়া সর্দার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নুরুল ইসলামকে ১৯৮৫ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন– দেশ মুক্ত হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাদু মিয়া বাংলাদেশে আসেন। তখন আওয়ামি লিগের নেতারা শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুরোধ করেছিলেন জাদু মিয়াকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে। কিন্তু দলের চাপ থাকা সত্ত্বেও জাদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পরবর্তীকালে জাদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল একটা উক্তির কারণে– 'আমি ক-দিনের মধ্যেই এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি।' এই উক্তির পর জাদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এর আগে নয়। সিধু মিয়ার দেওয়া তথ্যমতে– জাদু মিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমান 'ফার্স্ট ফ্রেন্ড' ছিলেন। দু'জনের মুক্তিযুদ্ধপূর্ববর্তী সম্পর্ককে সিধু মিয়া 'অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব' বলে উল্লেখ করেছেন। সিধু জাদুকে বলেছিলেন– 'তুমি ঢাকায় এসে বসে আছো কেন? তোমাকে নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছে। তুমি একটু সরে থাকো।' সিধু এ-কথা বলার সাথে-সাথে জাদু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফোন করেন এবং মুজিবকে বলেন– 'তুই নাকি আমাকে অ্যারেস্ট করবি?' ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা মুজিব কী বলেছিলেন, সিধু তা বলতে পারেননি। তবে, এটুকু জানিয়েছেন সেদিনকার ফোনালাপে মুজিব ও জাদুর মধ্যে হাসিঠাট্টা হয়েছিল (সূত্র– বেলা-অবেলা, মহিউদ্দিন আহমদ)।

খুলনার অন্যতম শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী ছিলেন মুসলিম লিগ-নেতা খান আবদুস সবুর। তিনি দালাল আইনে গ্রেপ্তার হয়ে কারাভোগও করছিলেন। কিন্তু

তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে চিঠি লিখতেই শেখ মুজিবুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে তার কারামুক্তির ব্যবস্থা করেন। দেশ টিভিতে আসাদুজ্জামান নুরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে (প্রচারকাল ১৫ ডিসেম্বর ২০২১) আওয়ামি লিগের প্রবীণ নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেছেন– "সবুর খান জেলে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাথে তো ভালো সম্পর্ক ছিল। সবুর খান চিঠি লিখছেন বঙ্গবন্ধুর কাছে– 'যে বাংলার স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে, মুজিব, সেই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে যখন ভাবি– যে-বাংলার প্রধানমন্ত্রী আমারই প্রিয় শেখ মুজিব, সেই বাংলার বৃদ্ধ সবুর খান আজও কেন কারাগারে? আমি তার উত্তর খুঁজে পাই না, মুজিব।' ব্যস, ইন্টারকমে আমাকে ফোন করল। আসো, আসলাম। কয়– চিঠিটা পড়ো। পড়লাম। আমারে জিজ্ঞেস করে– 'হোয়াট ইজ ইয়োর রিঅ্যাকশন?' আমি বললাম– 'আমার তো মনে হয় আপনি এখনই ছেড়ে দেবেন।' কয়– 'ইয়েস। আই হ্যাভ ডিসাইডেড আই উইল রিলিজ হিম।' তখন বঙ্গবন্ধু মশিউর রহমানকে ডাকলেন (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের তৎকালীন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনীতি-বিষয়ক উপদেষ্টা)। মশিউর রহমান বললেন– 'স্যার, ইচ্ছে করলেই তো ছাড়া যাবে না, আইনকানুনের ব্যাপার আছে।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ফরগেট অ্যাবাউট ইট। বটম লাইন– হি উইল রিচ হিজ হাউজ টুনাইট।' সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করল। জেলখানা থেকে সবুর খানরে আইন্না সবুর খানের ধানমন্ডি ২৫ নাম্বারের বাড়িতে পৌঁছায়া দেওয়া হইছে।" অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পূর্বপরিচয়কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একটা চিঠির প্রেক্ষিতে একজন যুদ্ধাপরাধীকেও কারামুক্ত করে দিয়েছিলেন, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়াও অবলম্বন করেননি।

দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত আরেক যুদ্ধাপরাধী শাহ্ আজিজুর রহমানও জেলে থাকাকালে তার পরিবারকে শেখ মুজিবুর রহমান আর্থিক সহায়তা পাঠাতেন। তোফায়েল আহমেদেরই মাধ্যমে মুজিব আজিজের পরিবারকে মাসে সাত হাজার টাকা করে পাঠাতেন। আজিজ ১৯৭৩ সালে 'সাধারণ ক্ষমা'র আওতায় কারামুক্ত হওয়ার পর মুজিব তাকে বাইশ হাজার টাকা দামের 'ভিভা ভক্সহল' গাড়িও উপহার দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সহকারী একান্ত সচিব শাহরিয়ার ইকবালের বর্ণনা থেকে জানা যায়– ১৯৭৫ সালের ১৯ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত

নৈশভোজে শেখ মুজিব শাহ্ আজিজকে অতিথি হিশেবে উপস্থিত রেখেছিলেন, উপস্থিত রেখেছিলেন দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত আরো একজনকে, নাম জহিরউদ্দিন। শাহ্ আজিজকে শেখ মুজিব পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোরও পরিকল্পনা করেছিলেন। 'সময়-অসময়' বইয়ে মহিউদ্দিন আহমদ এই তথ্যগুলো উল্লেখ করেছেন। তথ্যগুলো তিনি নিয়েছেন শাহরিয়ার ইকবালের স্মৃতিচারণমূলক লেখা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : কাছে থেকে দেখা' থেকে।

শীর্ষ স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি প্রদর্শিত শেখ মুজিবুর রহমানের এই নমনীয় আচরণকে দুইভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। একে, প্রথমত, মহানুভবতা হিশেবেই উপস্থাপন করা যায়। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল সেই দেশগুলোর স্বীকৃতি, যেসব দেশ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল। সেই স্বীকৃতি আদায় করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশে-বিদেশে বিভিন্নভাবে সমঝোতা করতে হয়েছে। পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য হলেও দেশী যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি তাকে নমনীয় হতে হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কোনো-কোনো স্বাধীনতাবিরোধীর বাড়িতে তিনি মাসে-মাসে টাকা পাঠিয়েছেন, চিঠি পেয়েই কারামুক্তির ব্যবস্থা করেছেন, গাড়ি উপহার দিয়েছেন। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে এই উদারতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। শেখ মুজিব বিরুদ্ধমতের আরো অনেককেই গোপনে টাকাপয়সা দিতেন। বিরোধীদলের নেতা আবদুল হামিদ খানকে টাকা-লুঙ্গি-গামছা পাঠাতেন। এই আচরণ নিঃসন্দেহে মুজিবের উত্তুঙ্গ উদার মনের পরিচয় বহন করে। মুজিব কেবল আওয়ামি লিগের প্রধানমন্ত্রী না হয়ে গোটা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়তে দল-মত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সদ্যস্বাধীন দেশে কোনো বিভক্তি না রাখতে।

কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য– মুজিব ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আইনেরও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে ফেলেছিলেন। সামান্য এক চিঠির প্রেক্ষিতে, আইনি প্রক্রিয়ার ধার না-ধেরে একজন প্রমাণিত যুদ্ধাপরাধীকে তাৎক্ষণিকভাবে কারাগার থেকে বের করে বাসায় পৌঁছে দেওয়া নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের জন্য সুখকর দৃষ্টান্ত না। দলের নেতারা গ্রেপ্তারের জন্য চাপ দেওয়া সত্ত্বেও সেরেফ ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য

আরেক যুদ্ধাপরাধীকে (জাদু মিয়া) গ্রেপ্তারের নির্দেশ না-দেওয়া– এও দুর্বল দৃষ্টান্তের উদাহরণ। ফজলুল কাদের চৌধুরী, শাহ্ আজিজুর রহমান– দু'জনই অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। চট্টগ্রামে কাদের-পরিবারের সহায়সম্পত্তির পরিমাণ রীতিমতো কিংবদন্তিতুল্য। যুদ্ধাপরাধী হওয়া সত্ত্বেও এত সম্পদশালী পরিবারগুলোকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অনুদান দেওয়ার খবর বা গাড়ি উপহার দেওয়ার সংবাদ নিশ্চয়ই শহিদ পরিবারগুলোকে স্বস্তি দেয়নি। শাহ্ আজিজুর রহমানকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর সিদ্ধান্তকেও আত্মঘাতীই বলতে হবে। অন্য রাষ্ট্রে, তা যে রাষ্ট্রেই হোক, স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিশেবে পাঠানো হবে একজন চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধীকে, একজন সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীকে– মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এও নিশ্চয়ই অসহ্য রকমের পীড়াদায়ক হতো। এমন না যে, শেখ মুজিবুর রহমান কোনো স্বাধীনতাবিরোধীকে দলের শীর্ষপদে জায়গা দিয়েছেন বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়ে পরে মন্ত্রী বানিয়েছেন। কিন্তু মাত্রই স্বাধীন হওয়া দেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি এমন শিথিল আচরণ দেশের মঙ্গল বয়ে আনেনি, মঙ্গল বয়ে আনেনি আওয়ামি লিগ বা ব্যক্তি মুজিবের জন্যও।

ফজলুল কাদের চৌধুরীর যে ছেলেদের হাতে টাকা দিয়ে কোরবানির জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সবচেয়ে বড় গরুটা কিনতে বলেছিলেন, সেই ছেলেদেরই একজন– সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আমৃত্যু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে গেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন। সালাউদ্দিন শেখ মুজিবুর রহমানকে 'শেমু রহমান' বলে সম্বোধন করতেন। আওয়ামি লিগের লোকজন সবকিছুতেই 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন' খুঁজে পায় দেখে ১৯৯৬ সালে ফেনীর এক জনসভায় খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে সালাউদ্দিন বলেছিলেন– 'বঙ্গবন্ধু এত বেশি স্বপ্ন দেখতেন যে, মনে হয় ওনার স্বপ্নদোষ আছিল।' কাদের-পরিবারের প্রতি প্রদর্শিত শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগ্রহের প্রতিদান ফজলুল কাদেরের ছেলে সালাউদ্দিন কাদের এভাবেই দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের আরেক প্রিয়পাত্র তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বড় ছেলে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনও মুক্তিযুদ্ধে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের ইত্তেফাক অফিস গুঁড়িয়ে দিলেও মইনুল হোসেন পাকিস্তান সরকারের সাথে দেনদরবার করে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই ইত্তেফাক ফের চালু করে পাকিস্তানের স্বার্থ বাস্তবায়ন করেছেন। সবকিছু জেনেও শেখ

মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে মইনুল হোসেনকে আওয়ামি লিগ থেকে মনোনয়ন দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মইনুল হোসেন খন্দকার মোশতাক আহমেদের ডেমোক্রেটিক লিগে যোগ দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ঔদার্যের প্রতিদান মইনুল হোসেনও এভাবেই দিয়েছিলেন।

দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত যে শাহ্ আজিজকে শেখ মুজিব অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর নৈশভোজে অতিথি করেছিলেন, পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন; সেই শাহ্ আজিজ 'সাধারণ ক্ষমা' পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিলেন এবং এই অপরাধে ১৯৭৪ সালের ১০ মে মাসে আবারও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। শুনলে এখন অবিশ্বাস্য মনে হবে– শাহ্ আজিজ মুক্তিযুদ্ধে নিহত রেজাকার-আলবদরদের পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে দাবি তুলেছিলেন, দালাল আইনে গ্রেপ্তার সব স্বাধীনতাবিরোধীর মুক্তি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ বিদেশে পালিয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের (যেমন গোলাম আজম) নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেছিলেন। অর্থাৎ নিজে 'সাধারণ ক্ষমা' পেয়ে ও শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগ্রহভাজন হয়ে লাইয়ে-লাইয়ে মাথায় চেপে বসেছিলেন। শাহ্ আজিজ এভাবেই শেখ মুজিবের আশকারার প্রতিদান দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ হত্যাকারীরা যাকে (জিয়া) সেনাপ্রধান বানিয়েছিল, শাহ্ আজিজ সেই জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং একপর্যায়ে জিয়ার প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। আজিজ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করে কোনো মুসলমান কবির লেখা গান জাতীয় সংগীত বানানোর জন্যও জিয়াউর রহমানকে চিঠি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আজিজ আমৃত্যু বাংলাদেশবিরোধী ছিলেন।

মশিউর রহমান জাদু মিয়া দালাল আইনের মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৭৪ সালে। শেখ মুজিবুর রহমানেরই জীবদ্দশায় ১৯৭৪ সালেই তিনি আবারও গ্রেপ্তার হন, মুক্তি পান ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে। তিনি দ্বিতীয়বার কেন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, হদিস পাইনি। গণভোট নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় জিয়াউর রহমান জাদুকে ১৯৭৭ সালে গৃহবন্দি করেছিলেন, জাদুর ছেলেদেরকে গ্রেপ্তার করিয়েছিলেন। অভিযোগ আনা হয়েছিল– জাদু মিয়ার

ছেলেরা জিয়াউর রহমানের গণভোটের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছেন। এই হাস্যকর অভিযোগে তাদেরকে তিন সপ্তাহ জেলে পুরে রাখা হয়, তারা ছাড়া পেয়েছিলেন গণভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। এই জাদুই পরে জিয়াউর রহমানের 'সিনিয়র মিনিস্টার' হয়েছিলেন (পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর সমান), বিএনপি-প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন এবং জিয়াউর রহমানকে সেনাশাসক থেকে রাজনৈতিক নেতা বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান যেসব স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন, তাদের কেউই পরবর্তীকালে মুজিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি, উলটো বিদ্রুপ করেছেন অথবা মুজিবের হত্যাকারীদের বানানো সেনাপ্রধানের সাথে যোগ দিয়েছেন।

এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ না করে ছদ্মবেশে পাকিস্তানের পক্ষেই কাজ করেছেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হতে না পারার ক্ষোভও তার মধ্যে ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়ে তিনি তাজউদ্দিনবিরোধী অপপ্রচারে লিপ্ত ছিলেন। তিনি প্রচার করতে থাকেন– তাজউদ্দিন অবৈধভাবে নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা তার (তাজ) নেই, দুর্বল নেতৃত্বের কারণে মুক্তিযুদ্ধ ঝিমিয়ে পড়েছে। একাত্তরে ইউএসএর পরিকল্পনা ছিল স্বায়ত্তশাসনের প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা এবং এভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা। ইউএসএ এই গোপন প্রক্রিয়ায় দু'জনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল– পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাককে আর পররাষ্ট্রসচিব মাহবুব আলম চাষিকে। কথা ছিল সেপ্টেম্বরে মোশতাক ইউএসএ গিয়ে ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে বক্তৃতা করবেন। কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ব্যাপারটা জেনে যান, মোশতাককে ইউএসএ পাঠানো থেকে বিরত থাকেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে ইউএসএগামী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন তথ্যসূত্র– (স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি)।

খন্দকার মোশতাকের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্র সুস্পষ্ট। তিনি বরাবরই পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চেয়েছেন, মুজিবনগর সরকারের

প্রধানমন্ত্রিত্ব চেয়েছেন। ইউএসএ ও পাকিস্তানের সাথে মোশতাকের ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে মুজিবনগর সরকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, তার পরিবর্তে অঘোষিতভাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন আবদুস সামাদ আজাদ। সবকিছু জেনেও স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান খন্দকার মোশতাককেই সবচেয়ে কাছে টেনেছিলেন এবং সপরিবার খুনের শিকার হয়ে এই শোচনীয় ভুলের মাশুল গুনেছিলেন। যদি ধরে নেওয়া হয়– মুজিব মোশতাকের মুক্তিযুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ডের কথা জানতেন না, তা হলেও বলতে হয়– মুজিবের উচিত ছিল তাজউদ্দিন-নজরুলদের কাছ থেকে সবকিছু জেনে নেওয়া। মুজিব বরাবরই ভুল মানুষদেরকে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন, বিশ্বাসঘাতকদেরকে পাশে রেখে বিশ্বস্তদের সাথে দূরত্ব তৈরি করেছেন। পরবর্তীকালে মোশতাকের হাত ধরেই বাংলাদেশে পাকিস্তানি ভাবধারার পুনঃপ্রচলন শুরু হয়েছিল এবং সেই ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রায় পুরোটা সময় পাকিস্তানে ছিলেন, অসুস্থ বাবাকে দেখতে বা অবকাশ যাপন করতে কয়েকবার রংপুরে এসেছেন। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানোর জন্য রংপুরের মুক্তিযোদ্ধারা শহিদ মুখতার ইলাহির নেতৃত্বে এরশাদের সাথে দেখা করার চেষ্টা করলে এরশাদ দেখা পর্যন্ত দেননি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাঙালি সেনাকর্মকর্তাদের বিচারের জন্য পাকিস্তানে যে ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল, এরশাদ ছিলেন সেই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি এরশাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য না থাকলে পাকিস্তান সরকার নিশ্চয়ই এরশাদকে এই দায়িত্ব দিত না। ১৯৭৩ সালে এরশাদ বাংলাদেশে ফিরে এসে দেখেন সেনাবাহিনীতে তার চাকরি নেই। বাংলাদেশে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যেসব বাঙালি সেনাকর্মকর্তা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানেই থেকে গিয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এরশাদ ছিলেন তাদেরই একজন। মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসির ভাষ্যমতে– ‘বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এরশাদ বাংলাদেশে ফেরত আসেন এবং চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য অস্থির

হয়ে পড়েন। তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী ও কুড়িগ্রামের আওয়ামি লিগ-নেতা রিয়াজউদ্দিন মিয়া একদিন সন্ধ্যায় এরশাদকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরিয়ে এর ওপর একটি মুজিব কোট পরিয়ে তার হয়ে তদবিরের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন– আমার ভাগনের চাকরিটা না থাকলে যুদ্ধ করে আমার কী লাভ হলো! এ কথা বলার সাথে-সাথে এরশাদ শেখ মুজিবের পা ছুঁয়ে সালাম করেন। শেখ মুজিব এতে খুশি হয়ে তাকে চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেন।' এরশাদকে চাকরিতে বহাল রাখার জন্য উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এরশাদ বেশকিছু যুদ্ধাপরাধীকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমানের স্বঘোষিত খুনিদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করিয়েছেন, মুজিবের খুনি সৈয়দ ফারুক রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, মুজিবের দুই খুনিকে নির্বাচনে জিতিয়ে এনে জাতীয় সংসদে আসীন হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলেন। যে শেখ মুজিবুর রহমানের পা ধরে এরশাদ নিজের চাকরি বাঁচিয়েছিলেন, এরশাদ সেই শেখ মুজিবুর রহমানের উদারতার প্রতিদান এভাবেই দিয়েছিলেন। জিয়াহত্যার পেছনেও এরশাদের সুস্পষ্ট ভূমিকা আছে। রাজনীতির নির্মম পরিহাস হলো– আওয়ামি লিগ-বিএনপি দুই দলই পরবর্তীকালে এরশাদকে নিজ-নিজ নির্বাচনী জোটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এরশাদের পদলেহন করেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের পুনর্বাসনকারী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে মন্ত্রী পদমর্যাদায় নিজের 'বিশেষ দূত' হিশেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বাধীনতাবিরোধী এরশাদের পুনর্বাসনে ভূমিকা রেখেছেন শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা– সবাই। উদারচিত্ত শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন এরশাদের মামার আবদার উপেক্ষা করলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে এরশাদের মতো একজন বিশ্ববেহায়াকে দেখতে হতো না। উল্লেখ্য, এরশাদকে 'বিশ্ববেহায়া' খেতাব দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইশুতে নব্বইয়ের দশকে আওয়ামি লিগ জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ আন্দোলন করেছিল মর্মে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে জোর আলোচনা আছে। অবশ্য আওয়ামি লিগ ও জামায়াত আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও জোট গড়ে তোলেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আওয়ামি লিগেরও ছিল, জামায়াতেরও ছিল, ফলে নব্বইয়ের দশকে এই দুই দলের কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য মিলে গিয়েছিল– আওয়ামি লিগের তরফ থেকে সংক্ষেপে এ রকম দাবি করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইন্টারনেটে ১৯৯৪ সালের জুন মাসের একটা ছবি প্রায়ই ভেসে বেড়ায়; যে ছবিতে পাশাপাশি বসে সাংবাদিকসম্মেলন করছেন শেখ হাসিনা, সাজেদা চৌধুরী, মওদুদ আহমদ আর মতিউর রহমান নিজামী। সেই সাংবাদিকসম্মেলন কী উপলক্ষে ছিল, কী বলা হয়েছিল সেখানে– তা অবশ্য নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কোথাও দেখেছি সাংবাদিকসম্মেলনটা জাতীয় সংসদে হয়েছিল, কোথাও দেখেছি প্রেসক্লাবে।

সেই সাংবাদিকসম্মেলনের আগে-পরে জামায়াতের সাথে আওয়ামি লিগের কী সম্পর্ক ছিল, তাও স্পষ্ট জানা যায় না। আওয়ামি লিগের তরফ থেকে সেই ছবির কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। ছবিটা সম্ভবত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো ব্যাখ্যাতীত। কেউ-কেউ বলেন নিজামী সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন না, চেয়ার খালি পেয়ে হুট করে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামি লিগের সভাপতির সাংবাদিকসম্মেলনে কারো যে হুট করে বসার সুযোগ নেই, তাও আবার নিজামীর মতো একজন যুদ্ধাপরাধীর– হুটতত্ত্বের প্রবক্তারা তা ভুলে যান। আওয়ামি লিগ ছবিটাকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চাইবে, যথাসম্ভব অস্বীকার করতে চাইবে। কিন্তু সাংবাদিকসম্মেলন যে উপলক্ষেই হোক, সেখানে যা-ই বলা হোক; ইতিহাসে ছবিটা খোদাই হয়ে থাকবে, ইতিহাসে লেখা থাকবে– আওয়ামি লিগ সভাপতি শেখ হাসিনা আর আল-বদরনেতা মতিউর রহমান নিজামী অন্তত একবার পাশাপাশি বসে সাংবাদিকসম্মেলন করেছেন। এক টেবিলে শেখ হাসিনা আর নিজামীর সাংবাদিকসম্মেলন হতে পারে কি না, ইতিহাসই এর উত্তর দেবে। আলোচ্য সাংবাদিকসম্মেলনে উপস্থিত থাকা সাজেদা চৌধুরী মারা গেছেন ২০২২

সালে, মওদুদ আহমদ ২০২১ সালে। নিজামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে ২০১৬ সালে। বেঁচে আছেন কেবল শেখ হাসিনা। সাজেদা, মওদুদ বা নিজামীর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ইতিহাস মরে যায়নি। ইতিহাস আরো অবশিষ্ট আছে।

মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আজমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২০১২ সালের ১১ জানুয়ারি। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন– '১৯৮০-এর দশকে এবং ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে বিএনপির বিরুদ্ধে জামায়াত ও আওয়ামি লিগ যুগপৎ আন্দোলন করেছিল, তখন কোনোদিন আওয়ামি লিগ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী মনে করেনি। ফেব্রুয়ারি ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর সরকারগঠনের জন্য আওয়ামি লিগ জামায়াতের সহযোগিতা প্রার্থনা করে আমার নিকট ধরনা দিয়েছিল, আওয়ামি লিগের নেতা আমির হোসেন আমু সাহেব জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেবের মাধ্যমে আমাকে মন্ত্রী বানানোর প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তখনও আওয়ামি লিগের মনে হয়নি জামায়াতে ইসলামি যুদ্ধাপরাধী। পরবর্তীকালে আওয়ামি লিগ মনোনীত প্রেসিডেন্টপদপ্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী জামায়াতের সমর্থন লাভের আবদার নিয়ে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখনও তাদের দৃষ্টিতে জামায়াত নেতৃবৃন্দ যুদ্ধাপরাধী ছিল না।'

আলোচ্য রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে জামায়াতের সাংসদরা ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। বিএনপির প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাস (স্বাধীনতাবিরোধী) পেয়েছিলেন একশো বাহাত্তর ভোট আর আওয়ামি লিগের বদরুল হায়দার পেয়েছিলেন বিরানব্বই ভোট। ফলে, জামায়াতের সাংসদরা বদরুল হায়দারকে ভোট দিলে বদরুল তাতেও জয়ী হতেন না। যা হোক, ১৯৯১-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামি লিগের প্রার্থী বদরুল হায়দার জামায়াতের বিশ সাংসদের সমর্থন লাভের আশায় গোলাম আজমের সাথে দেখা করেছিলেন– এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর

আওয়ামি লিগ সরকারগঠনের উদ্দেশ্যে জামায়াতের সহযোগিতা চেয়েছিল, গোলাম আজমকে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দিয়েছিল– এই তথ্য কখনও তেমন একটা আলোচিত হতে দেখা যায় না। আওয়ামি লিগ আজমের এই বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদও করেনি, দাবি করেনি– আমু মুজাহিদের মাধ্যমে গোলাম আজমকে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দেয়নি। আজমের এই দাবি সত্য হয়ে থাকলে, অর্থাৎ ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর আওয়ামি লিগ সরকারগঠনের উদ্দেশ্যে জামায়াতের সহযোগিতা চেয়ে থাকলে আওয়ামি লিগের গোটা রাজনীতিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে, প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে জামায়াতের সাথে জোট গঠনের অপরাধে বিএনপিকে দোষারোপ করা।

জামায়াতের সাথে কখনও আনুষ্ঠানিক জোট না হলেও আওয়ামি লিগ ধর্মভিত্তিক আরেক রাজনৈতিক দল খেলাফত মজলিশের সাথে নির্বাচনী জোট গঠন করেছিল। ২০০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর আওয়ামি লিগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল খেলাফত মজলিশের তৎকালীন আমির আজিজুল হকের সঙ্গে পাঁচদফা সমঝোতাস্মারক সই করেন। দফাগুলো হলো আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় গেলে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না, কওমি মাদ্রাসার সনদের সরকারি স্বীকৃতি দেবে, সনদপ্রাপ্ত 'হক্কানি' আলেমদেরকে ফতোয়া জারির সুযোগ দেবে, নবি-রাসুল ও সাহাবিদের সমালোচনাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করে আইন প্রণয়ন করবে (অর্থাৎ ব্লাসফেমি আইন পাশ করবে) এবং হজরত মুহম্মদকে (সা) সর্বশেষ নবি বলে ঘোষণা করবে (অর্থাৎ কাদিয়ানিদেরকে অমুসলমান বলে রায় দেবে)। তীব্র সমালোচনার মুখে আওয়ামি লিগ অবশ্য এই চুক্তি বাতিল করেছিল।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না– খেলাফত মজলিশের এই আজিজুল হক একজন স্বঘোষিত স্বাধীনতাবিরোধী। ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল আজিজের সাক্ষাৎকার। সেখানে তিনি বলেছিলেন– 'একাত্তরে আমগো অবস্থান ছিল নিরপেক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। আমরা কখনোই চাই নাই পাকিস্তান ভাইঙ্গা বাংলাদেশ স্বাধীন হোক।' আজিজ স্বাধীন বাংলাদেশেও ধর্মীয় উগ্রবাদ ও পশ্চাৎপদতা বিস্তারে ভূমিকা পালন

করেছেন, ১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় তিনি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা উসকে দিতে চেয়েছিলেন। তার ছেলে মামুনুল হকও ওয়াজ মাহফিলে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। ২০১৩ সালের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতের তাণ্ডবের অন্যতম কারিগর মামুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশত বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে হেফাজতে ইসলাম ২০২১ সালের মার্চে দেশজুড়ে যে আরেক দফা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, মামুন সেটিরও অন্যতম রূপকার। মামুনই শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য বুড়িগঙ্গায় ছুড়ে ফেলার হুমকি দিয়েছেন।

আরো মনে রাখতে হবে– আলোচ্য চুক্তি সম্পাদনকালে খেলাফতের নায়েবে আমির ছিলেন মোহাম্মদ ইসহাক। এই লেখায়ই যে মুক্তিযুদ্ধকালীন মালেক মন্ত্রিসভার কথা উল্লেখ করেছি (যে মন্ত্রিসভার সদস্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন গণহত্যা সংঘটনে), এই ইসহাক ছিলেন সেই মালেক মন্ত্রিসভারই একজন মন্ত্রী। আরো সাত মন্ত্রীর সাথে ইসহাকও ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং পরবর্তীকালে দালাল আইনে জেল খাটেন। ঐ ইসহাকই বর্তমানে খেলাফতের আমির। দেখা যাচ্ছে– আওয়ামি লিগের সাথে চুক্তি সম্পাদনকালে যিনি খেলাফতের আমির ছিলেন, তিনিও স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন; যিনি বর্তমানে খেলাফত-আমির, তিনি রীতিমতো দালাল আইনে জেল খাটা স্বাধীনতাবিরোধী। অর্থাৎ আওয়ামি লিগও স্বাধীনবিরোধীদের সাথে জোট করেছিল এবং তা খুব বেশি আগের কথা না, মাত্র ২০০৬ সালের কথা। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি যে নির্বাচনটা হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি, সেই নির্বাচনটা তখন হয়ে গেলে খেলাফতের সাথে আওয়ামি লিগের আলোচ্য চুক্তিটাও বহাল থাকত এবং নির্বাচনের পর আওয়ামি লিগ খেলাফতকে হয়তো একটা মন্ত্রিত্বও দিত, তখন দেখা যেত স্বাধীনতাবিরোধী আজিজ বা ইসহাকের গাড়িতে উড়ছে আওয়ামি লিগ-প্রদত্ত জাতীয় পতাকা।

বামপন্থিদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সশস্ত্র বিরোধিতা

করেছিলেন, তাদের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা। তিনি মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন; মুক্তিযুদ্ধকে তিনি মনে করতেন 'দুই কুকুরের লড়াই'। স্বাধীন বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও তিনি পালিয়ে যান, ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে পরোয়ানা প্রত্যাহার হওয়ার পর ফের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন এবং ব্রিটিশ আমলে মাস্টারদা সূর্যসেনের সাথে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুট করা কনিষ্ঠ সদস্য সুখেন্দু দস্তিদারের সাথে মিলিত হয়ে 'বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল' গঠন করেন। অর্থাৎ সাম্যবাদী দল গঠনের পেছনে জড়িয়ে আছেন একজন স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি, যিনি যুদ্ধাপরাধ মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে পালিয়ে ছিলেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামি লিগ যে চৌদ্দ দলীয় মহাজোট গঠন করেছিল, এই সাম্যবাদী দল সেই চৌদ্দ দলের এক দল। ঐ নির্বাচনের পর সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়াকে আওয়ামি লিগ শিল্পমন্ত্রী বানিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে দিলীপ বড়ুয়ার ভূমিকা কী ছিল, খুঁজে পাইনি; তবে, 'বাংলা ইনসাইডার' নামক একটি আওয়ামি লিগ-পন্থি অনলাইন পত্রিকা ২০২০ সালের ৬ মার্চ উল্লেখ করেছে দিলীপও মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' মনে করতেন এবং শুরুর দিকে তার রাজনৈতিক জীবনের মূল মন্ত্র ছিল আওয়ামি লিগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতা (উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন– 'বাংলা ইনসাইডার' নির্ভরযোগ্য কোনো পত্রিকা না)। মুক্তিযুদ্ধে দিলীপ বড়ুয়ার ভূমিকা খুঁজতে গিয়ে দেখলাম বাংলা নিউজ পত্রিকা ২০২৩ সালের ১২ আগস্ট দিলীপ বড়ুয়ার একটা বক্তব্য প্রকাশ করেছে। শোকদিবসের আলোচনাসভায় প্রেসক্লাবে দিলীপ বলেছেন– 'আমরা ষাটের দশকে আন্দোলন করেছি, সত্তরের দশকে আন্দোলন করেছি, ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছি। এজন্য এ কথা বলতে পারি– যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে না, তারা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করতে পারে; কোনো বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করতে পারে না।' দিলীপ ৭ মার্চের ভাষণ শোনার কথা শুনিয়েই থেমে গিয়েছেন, আর সামনে এগোননি, বলেননি– যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এখান থেকে অনুমান করা যায়– নিজের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার কথা তিনি এখন আর খোলাসা করতে চান না, ৭ মার্চ পর্যন্তই সই।

যা হোক, সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টির বরাত দিয়ে ‘প্রথম আলো’ ২০১১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ‘দিলীপ বড়ুয়া যে কারণে মন্ত্রী’ শিরোনামে লিখেছে– ‘শেখ হাসিনা তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে দিলীপ বড়ুয়াকে কম হুমকি বলে মনে করেছিলেন। এ কারণেই বাম রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক জ্যেষ্ঠ নেতাকে বাদ দিয়ে তিনি দিলীপ বড়ুয়াকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। উইকিলিকস এই তারবার্তাটি ফাঁস করে।’ উল্লেখ্য ২০০৮ সালের নির্বাচনে দিলীপ অংশগ্রহণ করেননি এবং আওয়ামি লিগ তাকে মন্ত্রী বানিয়েছিল টেকনোক্র্যাট কোটায়। দিলীপ বড়ুয়া স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন কি না– নিশ্চিত না। কিন্তু তার দলের প্রতিষ্ঠাতা (তোয়াহা) সশস্ত্র স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন। একজন স্বাধীনতাবিরোধীর প্রতিষ্ঠিত দলের সঙ্গে আওয়ামি লিগ কেন জোট করল, কেন সেই দলের সাধারণ সম্পাদককে মন্ত্রিত্ব দিল, দলটাকে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করল– আওয়ামি লিগকে কেউ এই প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে বলে অদ্যাবধি শুনিনি।

আওয়ামি লিগ যে কখনোই কোনো স্বাধীনতাবিরোধীর গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়নি, অর্থাৎ কোনো স্বাধীনতাবিরোধীকে মন্ত্রী করেনি; তা নয়। আওয়ামি লিগ অন্তত দুজন স্বাধীনতাবিরোধীকে মন্ত্রী বানিয়েছে। শেখ হাসিনার প্রথম মন্ত্রিসভার ধর্মপ্রতিমন্ত্রী ছিলেন নুরুল ইসলাম। জামালপুরের এই নেতা ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদারকে পরাজিত করে পুরস্কার হিশেবে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। তিনি একাত্তরে রেজাকার ছিলেন বলে শক্ত অভিযোগ আছে; যদিও জীবদ্দশায় তিনি নিজেও তা কখনও স্বীকার করেনি, আওয়ামি লিগও স্বীকার করে না। ২০০১-এর নির্বাচনের আগে সরিষাবাড়ি উপজেলা আওয়ামি লিগ সাংবাদিকসম্মেলন ডাকতে বাধ্য হয়েছিল, ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছিল নুরুল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা। উপজেলা আওয়ামি লিগ ঐ সাংবাদিকসম্মেলনে সাফাই গেয়েছিল এই মর্মে– নুরুল ইসলাম একাত্তরে রেজাকার ছিলেন কি না, তা স্পষ্ট না। সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সাধারণত সব মন্ত্রী-সাংসদের জানাজা হলেও সেখানে নুরুল ইসলামের জানাজা হয়নি, মুক্তিযোদ্ধাদের আপত্তির মুখে ঐ জানাজা বাতিল হয়েছিল মর্মে উইকিপিডিয়ায় তথ্য পেয়েছিলাম। তথ্যসূত্র হিশেবে উইকিপিডিয়ায় যে দুটো পত্রিকার লিংক সংযুক্ত ছিল, তা এখন ‘স্থায়ীভাবে অকার্যকর’ দেখাচ্ছে।

যে দুজনকে আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষের অন্যতম স্থপতি বলে ধরা হয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে– সেই আবুল কাশেম ফজলুল হক (শের-এ-বাংলা) ও হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির সন্তানরাও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দির মেয়ে বেগম আখতার সোলায়মান যে কেবল মুখে-মুখে স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন, তা না। একাত্তরে আওয়ামি লিগের যেসব নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি, আখতার তাদেরকে নিয়ে আলাদা একটা রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন; এমনকি রেজাকারবাহিনীর আদলে আরেকটা 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গড়তে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এক রেজাকারবাহিনী দিয়ে তার পোষাচ্ছিল না, তার আরো রেজাকার লাগবে। স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হকের মেয়ে রইসি বেগমও। ১৯৭১ সালের ২ মে তিনি বলেন– '(১৯৭১ সালের) ২৬ মার্চ আমাদের সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানির জন্য মুক্তির দিন। এ দিনে আমরা এক উগ্র মতবাদ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। এ মতবাদ ইসলাম ও পাকিস্তানি আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। পাক সীমান্তের অপর পারের সংঘবদ্ধ সাহায্যপুষ্ট ও প্ররোচিত মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহীর দ্বারা আমরা সন্ত্রস্ত ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিন্তু, আলহামদুলিল্লাহ, নির্যাতিত অসংখ্য মুসলমানের প্রার্থনা আল্লাহ শুনেছেন এবং পাকিস্তানকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষের পক্ষে আমি আমাদের অদম্য সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনানীদেরকে সালাম জানাই।' রইসি বেগম আরো বলেন– 'আলহামদুলিল্লাহ, শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুচররা চিরদিনের জন্য মঞ্চ থেকে অপসারিত হয়েছে। শয়তানি শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করার শক্তি যেন আমাদের অজেয় সশস্ত্র বাহিনীকে আল্লাহ দান করেন।'

আবুল কাশেম ফজলুল হকের ছেলে আবুল কালাম ফয়জুল হক ছিলেন ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামি লিগের বিজয়ী একশো সাতষট্টি সাংসদের একজন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের তিনি পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল তিনি বলেছিলেন– 'আমি আমার পূর্ব পাকিস্তানি ভাইদের আমাদের এবং প্রশাসনযন্ত্রের ওপর আস্থা রাখার আবেদন জানাচ্ছি। যারা এখনও কোনো কারণবশত কিংবা কোনো মোহে পড়ে কাজে যোগদান করেননি, তাদের আমি শুধু বলব– সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যদি আমাদের নিজেদের সঠিক পথে ফিরে যাই, তা হলে প্রত্যেকটি মিনিটের

নিজস্ব একটি মূল্য রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে একই মানুষ হিশেবে ছ'বছর আগে আমরা যেমন ভারতের নগ্ন আক্রমণকে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম, এখনও তেমনিভাবে তাদের নগ্ন আক্রমণের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা আমাদের স্বার্থ ও আদর্শের জন্য সংগ্রাম করছি। ইনশাআল্লাহ, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।' আখতার সোলায়মান, রইসি বেগম ও ফয়জুল হকের ব্যাপারে অদ্যাবধি যা-কিছু লিখলাম, সবকিছুর উৎস হলো 'মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র' কর্তৃক প্রকাশিত বই 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়'। যা হোক, ফয়জুল হক দালাল আইনে গ্রেপ্তার হয়ে কারাভোগ করেন এবং ১৯৭৯ সালে বিএনপিতে যোগ দিয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন।

চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হলো– ফয়জুল হক পরবর্তীকালে আবারও আওয়ামি লিগে যোগ দেন এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগের টিকেটে সাংসদ হন, আওয়ামি লিগ তাকে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বানায়। জামালপুরের নুরুল ইসলামের স্বাধীনতাবিরোধিতা প্রমাণিত না হলেও বরিশালের ফয়জুল হকের স্বাধীনতাবিরোধিতা প্রমাণিত ও মীমাংসিত। ইতিহাস থেকে আওয়ামি লিগ মুছে দিতে পারবে না– দালাল আইনে জেল খাটা স্বাধীনতাবিরোধী ফয়জুল হককে আওয়ামি লিগ ১৯৯৬ সালে প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছিল, স্বাধীনতাবিরোধীর গাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ার ব্যবস্থা করেছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া অন্য সব শাসকের মন্ত্রিসভায়ই স্বাধীনতাবিরোধী ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আওয়ামি লিগের জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলায় অনেক স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন; জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও আওয়ামি অনেক স্বাধীনতাবিরোধীকে মনোনয়ন দিয়েছে, এখন দিচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধীদের সন্তানদেরকে। বিভিন্ন সময়েই শোনা যায়– কোনো বড় নেতার হাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জামায়াতে ইসলামির এক ঝাঁক নেতাকর্মী আওয়ামি লিগে যোগ দিয়েছেন। এ নিয়ে আওয়ামি লিগে প্রকাশ্য সমালোচনা হয় না বললেই চলে, উলটো শোনা যায়– সংশোধনের সুযোগ না দিলে এরা উগ্রবাদী কাজকর্ম করবে, বিএনপিতে যোগ দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে আরো শক্তিশালী করবে, মেধার অপচয় হবে। অর্থাৎ তখন আওয়ামি লিগ পরিণত হয় মাদকাসক্ত পুনর্বাসনকেন্দ্রে। আওয়ামি লিগে যোগ দেওয়ার আগ পর্যন্ত জামায়াত-

নেতারা রেজাকার থাকলেও আওয়ামি লিগে যোগ দেওয়ার পরক্ষণেই তারা হয়ে যান নও-মুক্তিযোদ্ধা। এমনকি, আজন্ম আওয়ামি লিগ করে আসা পুরোনো নেতাকর্মীদেরকে উপেক্ষা করে এই নও-মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই আওয়ামি লিগে দেওয়া হয় অধিকতর লোভনীয় পদ-পদবি। স্বাধীনতাবিরোধীদের বংশধরদের সাথে আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় নেতাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও কিংবদন্তিতুল্য, এর তালিকা তৈরি করতে গেলে তা রীতিমতো একটা ওয়েবসাইটে পরিণত হবে। আওয়ামি লিগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের বেয়াইয়ের বাবারা কিংবা বেয়াইরা চিহ্নিত রেজাকার। সেসবের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তর আসে– 'আমার বেয়াই ইচ্ছে করে রেজাকার হননি, তাকে জোরপূর্বক রেজাকার বানানো হয়েছিল' অথবা 'একাত্তরে তিনি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন, হিন্দুদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন' অথবা 'রেজাকার মানেই যুদ্ধাপরাধী না, যুদ্ধাপরাধী মানেই রেজাকার না।' অর্থাৎ আওয়ামি লিগের রেজাকাররাও রেজাকার না, অন্যান্য দলের মুক্তিযোদ্ধারাও রেজাকার।

২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে ভাষাসৈনিক আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছিলেন– 'আওয়ামি লিগের ভেতরে জামায়াতের লোকও আছে। আওয়ামি লিগে কত রেজাকার আছে! বিপদের সময়ে এরা ভয়ানকভাবে আসে। রেজাকারদের লিস্ট করার আগে এই রেজাকারদের তালিকা প্রকাশ করা উচিত। রেজাকারদের তালিকা করলে দেখা যাবে, রেজাকাররাই সেই তালিকা তৈরি করছে। ওই তালিকায় মুক্তিযোদ্ধারা রেজাকার, রেজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যাবে। অনেক রেজাকার আছে। এখনও আছে। এমনকি আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার আশপাশেও আছে। তাদের নাম বললে আমার আর ঢাকায় আসা হবে না। তাই আমি নাম বলতে চাই না। এই হচ্ছে অবস্থা।'

'আজকের কাগজ' পত্রিকায় ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে আহমদ ছফা লিখেছিলেন– 'আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, আওয়ামি লিগের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি। শুধু তার দুর্নীতি এবং অহংপুষ্ট মনোভাবের সমালোচনা করেছি বলে আওয়ামি লিগের লোকেরা আমাদের প্রাপ্য সম্মান, অধিকার এবং মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। আজকে আওয়ামি লিগকে জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে। কোন

জামায়াত– যারা একাত্তরে নরহত্যা করেছে বলে অভিযোগ করা যায়। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। আমি সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই– আমাদের অপরাধ ছিল কি? মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের থেকেও আমরা কি অধিকতর অপরাধী ছিলাম?' একই কলামে তিনি আরো লিখেছেন– 'আওয়ামি লিগ বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল। তাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রামটি পরিচালিত হয়েছে বটে। এই সংগ্রামের একটি জাতীয় চরিত্র ছিল। জাতীয় সংগ্রামকে দলীয় সংগ্রামে পরিণত করতে যেয়ে আওয়ামি লিগকে শুরু থেকে পর্যায়ক্রমে একই অপরাধ করে যেতে হচ্ছে, সেই একই ধরনের অপরাধের মধ্যে যেটি সবচেয়ে কলঙ্কময়, সেটি হলো জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যে আবদ্ধ হওয়া। আওয়ামি লিগ স্বাধীনতার পক্ষে সমস্ত শক্তিকে অস্বীকার করে দলীয়ভাবে যখন স্বাধীনতার ধারক-বাহকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়, তার দুর্বল মেরুদণ্ডের জন্যে স্বাধীনতাকে সে ধারণ করতে পারে না। জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বদলে দলীয় অহমিকা তার এতই প্রবল যে, সেটা টিকিয়ে রাখার জন্যে জাতীয় শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তার বাধে না। আমি একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম– আওয়ামি লিগ যখন জেতে, শেখ হাসিনা ও তার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা জেতে। কিন্তু আওয়ামি লিগ যখন হারে, গোটা বাঙালি জাতি পরাজিত হয়– এই সত্যটি আওয়ামি লিগ অনুধাবন করবে কি?'

কয়েকজন স্বাধীনতাবিরোধীর পরিবারকে শেখ মুজিবুর রহমান উদারতা দেখিয়ে প্রতীকী খোরপোশ দিয়েছিলেন। এই বাবদ তাকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সুযোগ কম। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক হিশাবনিকাশ মোটেই সরলরৈখিক বা সহজ-সরল ছিল না। তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির মারপ্যাঁচে শেখ মুজিবুর রহমানকে এমন অনেক কিছুই করতে হয়েছে, যা তার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালের মন্ত্রিসভায় দুজন স্বাধীনতাবিরোধীকে ঠাঁই দেওয়ার পক্ষে কোনো অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ আওয়ামি লিগের নেই। ১৯৯১-এর রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে জামায়াতের সহযোগিতা চাওয়াকেও আওয়ামি লিগ এখন অস্বীকার করতে চাইবে, ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চাইবে। ১৯৯১-এ সরকারগঠনের জন্য আওয়ামি লিগ জামায়াতের সহযোগিতা চেয়েছিল বা গোলাম আজমকে মন্ত্রিত্ব দিতে চেয়েছিল– আজমের এই দাবি সত্য হলে তা আওয়ামি লিগের এখনকার রাজনীতিকে শূন্য দিয়ে গুণ করে দেয়। যেকোনো সংখ্যাকে শূন্য

দিয়ে গুণ করলে ফলাফল শূন্যই হয়। ফয়জুল হককে আওয়ামি লিগ কেন মন্ত্রিত্ব দিয়েছিল, গোলাম আজমকে আওয়ামি লিগ মন্ত্রিত্ব সেধেছিল কি না, সাধলে কেন সেধেছিল, আওয়ামি লিগের প্রার্থী বদরুল হায়দার চৌধুরী কেন রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের প্রাক্কালে গোলাম আজমের সাথে দেখা করেছিলেন, সাংবাদিকসম্মেলনে শেখ হাসিনার পাশে নিজামী কেন, একানব্বইয়ে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে জামায়াত বদরুল হায়দারকে সমর্থন দিলে বা গোলাম আজম আওয়ামি লিগের মন্ত্রিত্ব নিলে এর বিশ বছর পর যুদ্ধাপরাধ মামলায় জামায়াত-নেতাদের বিচার হতো কি না– ইতিহাস আওয়ামি লিগকে এসব প্রশ্নের মুখোমুখি করবেই। এসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আওয়ামি লিগ ইতিহাসের পুলসিরাত পেরোতে পারবে না।

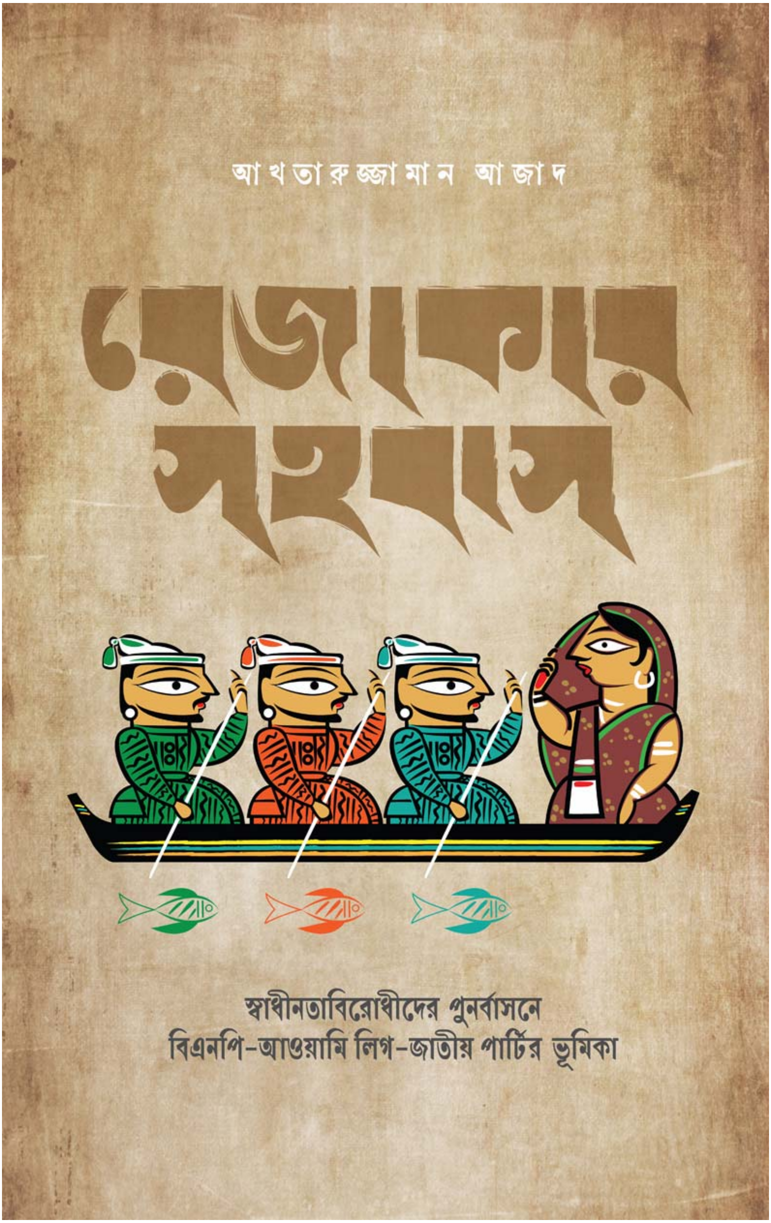
আখতারুজ্জামান আজাদ
রেজাকার সহবাস
স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে
বিএনপি-আওয়ামি লিগ-জাতীয় পার্টির ভূমিকা

আওয়ামি লিগের জামায়াতভীতি ও জামায়াতপ্রীতি

২৪ আগস্ট ২০২৩

আওয়ামি লিগের আমলে যখনই কোনো ভুতুড়ে গ্রেপ্তারকাণ্ড বা হামলার ঘটনা ঘটে এবং ওপরের মহল যদি যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে না পারে ঐ ব্যক্তিকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা আওয়ামি লিগের অঙ্গসংগঠনগুলো যদি ব্যাখ্যা দিতে না পারে হামলা কেন সংঘটিত হলো, তখনই আওয়ামি লিগের প্রাণরক্ষাকারী দৈত্য হিশেবে এগিয়ে আসে জামায়াতে ইসলামি। আওয়ামি লিগ খুব সহজেই একটা অজুহাত উপস্থাপন করতে পারে– যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা যার ওপর হামলা করা হয়েছে, সে আসলে জামায়াতকর্মী। এই এক অজুহাত প্রয়োগ করেই আওয়ামি লিগ দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইশুতে অনায়াস দায়মুক্তি পেয়ে আসছে। এ কথা সবার জানা– জামায়াত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিচালিত গণহত্যায় দালাল হিশেবে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে, ক্ষেত্রবিশেষে নিজেরাই নিজ দায়িত্বে গণহত্যা পরিচালনা করেছে। জামায়াতে ইসলামির নেতারা কেবল ব্যক্তিগতভাবেই যুদ্ধাপরাধ করেননি, সমগ্র জামায়াতকে দলীয়ভাবেই যুদ্ধাপরাধী সংগঠন প্রমাণ করা সম্ভব। জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিশেবে আওয়ামি লিগ সরকার নিষিদ্ধ করার সুযোগ বারবার পেয়েছে। কিন্তু আওয়ামি লিগ তা করেনি, বরং জামায়াতের রাজনীতি কলসিভর্তি টাকিমাছের মতো জিইয়ে রেখেছে। জামায়াত যেহেতু নিষিদ্ধ সংগঠন না, সেহেতু কেউ গ্রেপ্তার হলেই এবং (গ্রেপ্তারের স্পষ্ট কারণ দেখাতে না পেরে) তাকে শুধু জামায়াত বলে প্রচার করলেই দায়মুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।

মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র বিরোধিতা শুধু জামায়াতে ইসলামিই করেনি। করেছিল আরো বেশকিছু রাজনৈতিক দল। সেসব দলের মধ্যে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং মুসলিম লিগের দুই গ্রুপ। তখন জামায়াতের নেতৃত্বে ছিলেন গেলাম আজম, কৃষক-

শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে এসএম সোলায়মান, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বে নুরুল আমিন। নেজামে ইসলামের নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আতাহার আলী ও মৌলভি ফরিদ আহমেদ। মুসলিম লিগের একাংশের নেতৃত্বে ছিলেন খাজা খায়েরউদ্দিন এবং অন্য অংশের নেতৃত্বে খান আবদুস সবুর আর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বাবা ফজলুল কাদের চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী আওয়ামি লিগ সরকার চাইলেই যারপরনাই সহজে এই ছয়টা রাজনৈতিক দলকে সেরেফ স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন হিশেবে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করে ফেলতে পারত, তাতে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করা হতো, শোধ হতো ইতিহাসের ঋণ। কিন্তু তৎকালীন সরকার এই দলগুলোকে নিষিদ্ধ করেনি। মুক্তিযুদ্ধকালে যেহেতু ধর্মের দোহাই দিয়ে গণহত্যা চালানো হয়েছিল, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী আওয়ামি লিগ সরকার তখন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। জামায়াত, মুসলিম লিগ, নেজামে ইসলাম ঐ সরকারের আমলে রাজনীতি করতে পারেনি স্বাধীনতাবিরোধী হওয়ার কারণে না, বরং ধর্মভিত্তিক সংগঠন হওয়ার কারণে। অথচ সরকারের উচিত ছিল ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকেও নিষিদ্ধ করা। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কেন তা করেননি, এর সদুত্তর কোথাও মেলে না।

ইসলামি ছাত্রশিবির নামে জামায়াতে ইসলামির যে ছাত্রসংগঠনের পরিচয় এখন পাওয়া যায়, একাত্তরে এর নাম ছিল ইসলামি ছাত্রসংঘ। জামায়াতের ছাত্রসংগঠন 'ইসলামি ছাত্রসংঘ' মতিউর রহমান নিজামী ও আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের নেতৃত্বে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নৃশংস ভূমিকা পালন করে। ছাত্রসংঘের নেতাকর্মীদের মধ্যে নরহত্যায় পারদর্শীদেরকে নিয়ে গঠন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের কিলিং স্কয়াড– আল-বদর, যার নেতৃত্বে ছিলেন নিজামী ও মুজাহিদ। একাত্তরে জামায়াতের চেয়েও, ক্ষেত্রবিশেষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চেয়েও বেশি হিংস্র ছিল ছাত্রসংঘ তথা আল-বদর। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর জিয়াউর রহমানের আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়, ফলে জামায়াতে ইসলামি স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে

ফেরার সুযোগ পায়। জামায়াত স্বাধীন দেশে স্বনামে রাজনীতি করলেও ছাত্রসংঘ তা পারেনি। ছাত্রসংঘ সাধারণ মানুষের কাছে ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক। সাধারণ মানুষ ছাত্রসংঘকে স্বনামে আর গ্রহণ করবে না– আল-বদরনেতা মীর কাশেম আলী এই আশঙ্কা থেকে ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে বসে 'বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির' নামে জামায়াতে ইসলামির নতুন ছাত্রসংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। অর্থাৎ যে ছাত্রসংঘের নাম পরিবর্তিত হওয়ার কথা ছিল মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী আওয়ামি লিগ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়ে, সেই ছাত্রসংঘ নাম পরিবর্তন করেছে নিজেদের গরজেই। খোদ পাকিস্তান আমলেই জামায়াত পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়েছিল দুইবার, ভারতেও একবার। জামায়াত ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়েছিল আবুল আলা মওদুদির হুকুমে কাদিয়ানি হত্যাকাণ্ডের কারণে, দ্বিতীয়বার নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯৬২ সালে– আইয়ুব খানের প্রণীত 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১'-এর সহিংস বিরোধিতা করার কারণে। শুধু বাংলাদেশেই জামায়াত আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও নিষিদ্ধ হয়নি। অথচ বাংলাদেশেই জামায়াতের যাবজ্জীবন নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য বা কোনো যুদ্ধাপরাধী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার জন্য সংসদে যে পরিমাণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা দরকার, ১৯৯৬ সালে আওয়ামি লিগের তা ছিল না– এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ২০০৮ সালের সংসদে আওয়ামি লিগের পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং ঐ সংসদ কার্যকর থাকাকালে আওয়ামি লিগ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের একাংশের বিচার নিশ্চিতও করেছে। কিন্তু সংসদে পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামি লিগ সরকার জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিশেবে নিষিদ্ধ করার কথা কল্পনাও করেনি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সান্ধ্য সংসদে আওয়ামি লিগের যে পরিমাণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল; তা দিয়ে সূর্যকে দক্ষিণ দিক থেকে ওঠানো থেকে শুরু করে নর-কে নারী কিংবা নারীকে নর বানানোও সম্ভব ছিল, সম্ভব ছিল আমগাছে আনারস ফলানোও। সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও আওয়ামি লিগ সরকার জামায়াতকে নিষিদ্ধ না করে বরং নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে একটা বিচিত্র চাল চেলেছে। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের কিছু ধারা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সাথে

সাংঘর্ষিক– এই অজুহাতে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল হিশেবে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে দিয়েছে; যা আওয়ামি লিগের অযৌক্তিক কূটকৌশল ছাড়া কিছু না। সুযোগ পেয়েও আওয়ামি লিগ সরকার জামায়াতকে নিষিদ্ধ না করেছে ১৯৭২ সালে; না করেছে ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ বা ২০১৮ সালে। স্বাধীনতাবিরোধী অন্যসব দলের (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, মুসলিম লিগ, নেজামে ইসলাম, কৃষক-শ্রমিক পার্টি) সাথে জামায়াতকেও ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ করে দিলে তখন কেউ সে ব্যাপারে টুঁ শব্দটাও করতে পারত না। ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ না করে যুদ্ধাপরাধী সংগঠনগুলোকে বাড়তে দিয়েছে আওয়ামি লিগই।

জামায়াতে ইসলামির মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'। ১৯৭১ সালে 'সংগ্রাম' তীব্রভাবে বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিনিধনে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল এই 'সংগ্রাম'। স্বাধীন বাংলাদেশেও 'সংগ্রাম' একই কাজ করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের মুখপত্র হিশেবে অন্তত সংগ্রামকে নিষিদ্ধ করতে পারত আওয়ামি লিগের ১৯৯৬-পরবর্তী চার সরকারের মধ্যকার যেকোনো একটা সরকার (উল্লেখ্য, 'সংগ্রাম'-এর প্রকাশনা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বন্ধ ছিল, জিয়াউর রহমানের আমল থেকে পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে)। আওয়ামি লিগ ন্যূনতম সেটুকুও করেনি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী, জামায়াতের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লাকে 'শহিদ' হিশেবে উপস্থাপন করে ২০১৯ সালে 'সংগ্রাম' একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। এর প্রেক্ষিতে আওয়ামি লিগের একটা অঙ্গসংগঠনের কিছু নেতাকর্মী মগবাজারে 'সংগ্রাম' কার্যালয়ে হামলা করে এবং সংগ্রাম-সম্পাদক আবুল আসাদকে নাজেহাল করে। কাদের মোল্লা কোনো হিশাবেই যে শহিদ না, এ ব্যাপারে ২০১৯ সালেও আলাদা নিবন্ধ লিখেছি; আবার কাদের মোল্লাকে শহিদ বলে আখ্যা দিলেই সেই পত্রিকার কার্যালয়ে হামলা করতে হবে, সে ব্যাপারে আপত্তি তুলে আজ লিখছি। আওয়ামি লিগের ঐ নেতাকর্মীদের উচিত ছিল একাত্তরে বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকা পালন করার অপরাধে গোটা 'সংগ্রাম' পত্রিকাকেই নিষিদ্ধ করার দাবিতে কঠোর আন্দোলনে যাওয়া। কিন্তু আন্দোলনের চেয়ে হামলা সহজ। আন্দোলনের পথে না গিয়ে তারা হামলার

সহজ পথেই হেঁটেছিলেন এবং একটা ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন। ইতিহাসে লেখা থাকবে– আওয়ামি লিগের আমলে বিরুদ্ধমতের একটা পত্রিকার কার্যালয়ে হামলা হয়েছিল, পত্রিকার বয়োবৃদ্ধ সম্পাদককে হেনস্তা করা হয়েছিল। কেন হেনস্তা করা হয়েছিল– ইতিহাস তা জানতে চাইবে না।

জামায়াতনেতাদের সাথে আওয়ামি লিগ-নেতাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বৃত্তান্ত তুলে ধরলে তা রীতিমতো ওয়েবসাইটের আকার ধারণ করবে। যুদ্ধাপরাধীদের সন্তানরা আওয়ামি লিগের টিকেটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে গিয়েছেন– এমন নজিরও ভূরি-ভূরি। ছাত্রলিগের উচ্চপদে ছাত্রলিগারের চেয়ে ছাত্রশিবিরের ছদ্মবেশী কর্মীর পরিমাণ বেশি– তা ছাত্রলিগের নবীনতম কর্মীটিও জানে। আমৃত্যু কারাদণ্ড ভোগরত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ছাত্রলিগের অসংখ্য নেতাকর্মী। সাঈদীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশকারী নেতাকর্মীদের একটা বড় অংশকে ছাত্রলিগ বহিষ্কার করতেও বাধ্য হয়েছে। এই শিবিরকর্মীরা আওয়ামি লিগের শীর্ষ নেতাদের অগোচরে ছাত্রলিগে প্রবেশ করেনি, জ্ঞাতসারেই প্রবেশ করেছে। জামায়াতের যেকোনো পর্যায়ের নেতা আওয়ামি লিগে যোগ দিলে আওয়ামি লিগ তাকে পুষ্পমাল্য দিয়েই বরণ করে নেয়।

ইন্টারনেটে ১৯৯৪ সালের জুন মাসের একটা ছবি প্রায়ই ভেসে বেড়ায়; যে ছবিতে পাশাপাশি বসে সাংবাদিকসম্মেলন করছেন শেখ হাসিনা, সাজেদা চৌধুরী, মওদুদ আহমদ আর মতিউর রহমান নিজামী। সেই সাংবাদিকসম্মেলন কী উপলক্ষে ছিল, কী বলা হয়েছিল সেখানে– তা অবশ্য জানা যায় না। জানা যায় না সেই সাংবাদিকসম্মেলনের আগে-পরে জামায়াতের সাথে আওয়ামি লিগের কী সম্পর্ক ছিল। আওয়ামি লিগের তরফ থেকে সেই ছবির কোনো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। ছবিটা সম্ভবত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো ব্যাখ্যাতীত। আওয়ামি লিগ ছবিটাকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চাইবে, যথাসম্ভব অস্বীকার করতে চাইবে। কিন্তু সাংবাদিকসম্মেলন যে উপলক্ষেই হোক, সেখানে যা-ই বলা হোক; ইতিহাসে ছবিটা খোদাই হয়ে থাকবে, ইতিহাসে লেখা থাকবে– আওয়ামি লিগ সভাপতি শেখ হাসিনা আর আল-বদরনেতা মতিউর রহমান নিজামী

অন্তত একবার পাশাপাশি বসে সাংবাদিকসম্মেলন করেছেন। এক টেবিলে শেখ হাসিনা আর নিজামীর সাংবাদিকসম্মেলন হতে পারে কি না, ইতিহাসই এর উত্তর দেবে। সেই সাংবাদিকসম্মেলনে উপস্থিত থাকা সাজেদা চৌধুরী মারা গেছেন ২০২২ সালে, মওদুদ আহমদ ২০২১ সালে। নিজামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে ২০১৬ সালে। সাজেদা, মওদুদ বা নিজামীর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ইতিহাস মরে যায়নি। ইতিহাস আরো অবশিষ্ট আছে।

জাতীয় পার্টি আওয়ামি লিগের মহাজোটে যোগ দেওয়ায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যেভাবে স্বৈরশাসক থেকে 'প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত' হয়ে গিয়েছিলেন; সেভাবে জামায়াতও মহাজোটে যোগ দিলে গোলাম আজম প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা, নিজামী তথ্যমন্ত্রী, মুজাহিদ খাদ্যমন্ত্রী হতেন না– এর নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবেন না, অন্তত ইতিহাস তা বলে না। ইতিহাস বলে– আওয়ামি লিগের পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রন্ধ্রে-রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা। ইতিহাস আরো বলে– সেরেফ নির্বাচনী বৈতরণি নির্বিঘ্নে পার হওয়ার জন্য আওয়ামি লিগ হেফাজতে ইসলামের মতো উগ্রবাদী গোষ্ঠীর সাথেও আপস করেছিল, হেফাজতের প্রেসক্রিপশন পাইপাই ও পইপই করে মেনে নিয়েছিল, হেফাজতের হুকুমে ওঠবস করেছিল। যে ছয়টা স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলের নাম এই নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে জামায়াত ছাড়া আর কোনোটার সক্রিয় অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। বাকিরা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, পুরানা পল্টনে সাইনবোর্ডসর্বস্ব কার্যালয় ভাড়া করে নামকাওয়াস্তে টিকে আছে অথবা বিএনপিতে যোগ দিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। বিএনপি বরাবরই যুদ্ধাপরাধী আর স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রকাশ্য সরাইখানা। বারবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আওয়ামি লিগ সরকার জামায়াতে ইসলামিকে এই যে নিষিদ্ধ করল না, এর পেছনে হয়তো দুটো কারণ আছে– প্রথমত, নিষিদ্ধ করলে জামায়াতের নেতারা সদলবল বিএনপিতে যোগ দিয়ে বিএনপিতে বিলীন হয়ে যাবেন, ফলে বিএনপি শক্তিশালী হবে; দ্বিতীয়ত, জামায়াত নিষিদ্ধঘোষিত হলে যেকোনো রাজনৈতিক ইশুতে দোষারোপ করার মতো দল, অর্থাৎ উদোর পিণ্ডি চাপানোর মতো উপযুক্ত বুধো আর পাওয়া যাবে না। নিষিদ্ধ না হওয়ায় আওয়ামি লিগ এখন যেকোনো কিছুকে 'যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের ষড়যন্ত্র' বলে পার পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, জামায়াতের সাথে জোট করায়

বিএনপিকেও খোঁটা দেওয়ার অবকাশ পাচ্ছে। জামায়াত নিষিদ্ধ হলে আওয়ামি লিগ কলসি-বন্দি টাকিমাছ হারাবে।

কোনো সংগঠন নিষিদ্ধঘোষিত হলে এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত যে-কাউকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেপ্তার করার অধিকার রাখে। কিন্তু নিষিদ্ধ না হলে সেরেফ সেই সংগঠনের কর্মী হলেই বা কেউ তাদের গোপন বা প্রকাশ্য বৈঠকে যোগ দিলেই তাকে গ্রেপ্তার করার বা বিনা বিচারে আটকে রাখার কোনো সুযোগ নেই। একটা সংগঠনকে হয় নিষিদ্ধ করতে হবে অথবা সেই সংগঠনের সমর্থকদের ওপর নির্বিচার নিগ্রহ বন্ধ করতে হবে। সেই সংগঠনের বা অন্য কোনো সংগঠনের সমর্থনে দেশে বা বিদেশে বসে কেউ কিছু লিখলে তার পরিবারের সদস্যদেরকে ধরে নেওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এসপারওসপার হবে শত্রুর সাথে, শত্রুর পরিবারের সদস্যদেরকে নাজেহাল করা সভ্যতার পরিচায়ক না। আওয়ামি লিগ সরকার জামায়াতকে নিষিদ্ধ না করে পাঁচ দশক ধরে জামায়াতকে নিয়ে যে রাজনৈতিক খেলা খেলছে, তা রাজনীতির জন্য অস্বাস্থ্যকর। মুক্তিযুদ্ধে নৃশংসতম ভূমিকা পালন করা সেরেফ 'সংগ্রাম' পত্রিকাকে যে আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ করতে পারেনি, বরং হামলা করতে হয়েছে তাদের কার্যালয়ে; সেই আওয়ামি লিগ জামায়াত ইশুতে যা যা বলে, এর সবটুকু বিশ্বাসযোগ্য না। আওয়ামি লিগের জন্য জামায়াত লাভজনক দাবার গুটি। বিএনপিকে যখনই খেলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, আওয়ামি লিগ তখনই ঝোলা থেকে জামায়াত কার্ড বের করে।

নির্বাচন কমিশনে জামায়াতের এখন নিবন্ধন নেই। পরবর্তী নির্বাচনে তারা স্বনামে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, অংশগ্রহণ করতে হবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিশেবে অথবা বিএনপির ধানের শিষ প্রতীক নিয়ে। জামায়াতের শীর্ষনেতারাও মৃত্যুদণ্ড, নব্বই বছরের কারাদণ্ড বা আমৃত্যু কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। বর্তমান সংসদেও আওয়ামি লিগের আছে ঘোড়াকে দিয়ে জোরপূর্বক ডিম পাড়ানোর মতো অবিশ্বাস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আওয়ামি লিগ সরকার এই পর্যায়েও জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিশেবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়নি বা নিষিদ্ধ করেনি, বরং রাজনৈতিক দাবার গুটি হিশেবে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে। জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার উপযুক্ত সময় অবশ্য পেরিয়ে গেছে। এখন নিষিদ্ধ করলে

আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়ে জামায়াত বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা আছে। জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার সর্বোৎকৃষ্ট সময় ছিল ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ। এখন সম্ভবত হাতে আর সময় নেই। ১৯৭২ থেকে ২০২৩-এ এসে এখন তা হলে মেনে নিতেই হয়– আওয়ামি লিগ এমনই এক মেশিন; যে মেশিনের এক প্রান্ত দিয়ে যুদ্ধাপরাধী ঢুকিয়ে দিলে অন্য প্রান্ত দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বেরিয়ে আসে, আবার এক প্রান্ত দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ঢুকিয়ে দিলে অন্য প্রান্ত দিয়ে যুদ্ধাপরাধী বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ আওয়ামি লিগের পক্ষে থাকলে কখনও-কখনও যুদ্ধাপরাধীও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায়, বিপক্ষে গেলে মুক্তিযোদ্ধাও যুদ্ধাপরাধী হয়ে যায়।

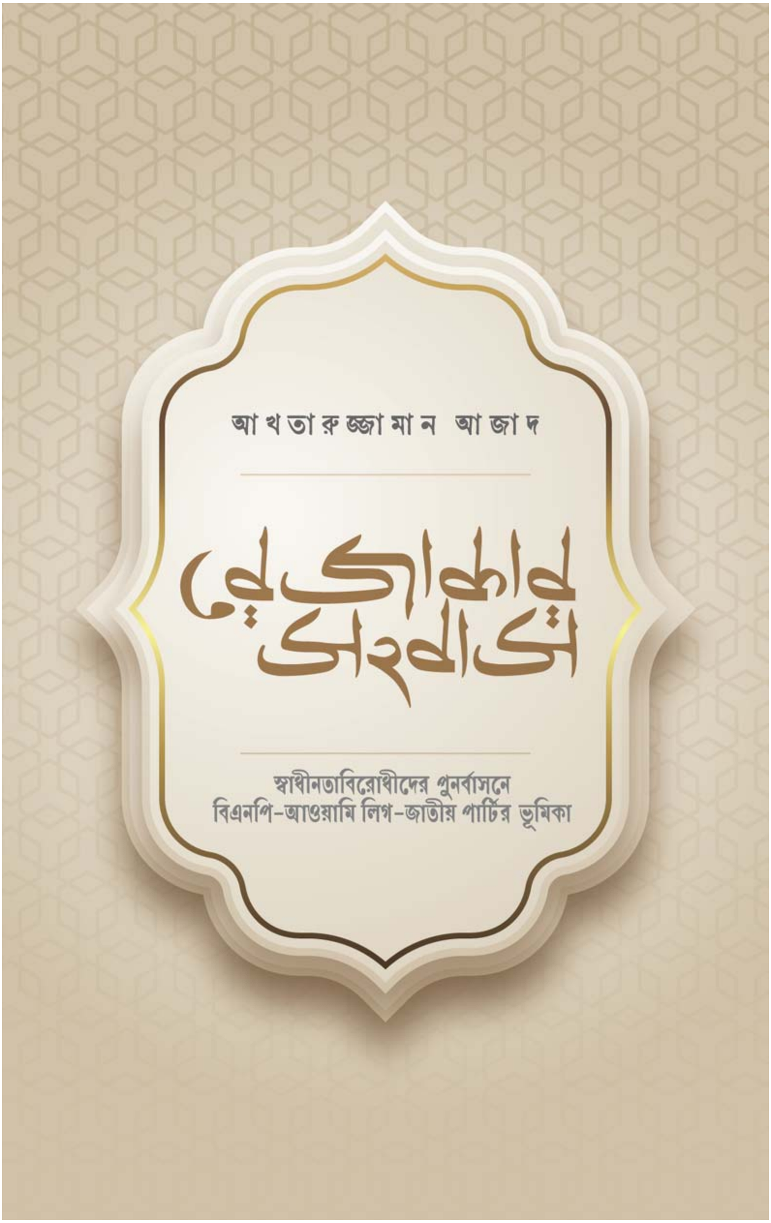
আখতারুজ্জামান আজাদ
রেজাকার সহবাস
স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে
বিএনপি-আওয়ামি লিগ-জাতীয় পার্টির ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধকালীন এরশাদ, মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী এরশাদ এবং রেজাকার পুনর্বাসন

২-৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সাধারণত বর্ণনা করা হয় একজন শীর্ষ-স্বৈরশাসক, কবিখ্যাতিলোভী কৌতুকাভিনেতা কিংবা নারীলিপ্সু নৈশ নাগর হিশেবে। তার চরিত্রটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে নাম শোনামাত্র চারদিকজুড়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হার্দিক হাসি চলে আসে। নব্বইপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি এমনসব কাজকারবার করতেন, তাতে অবশ্য তাকে কৌতুকাভিনেতা মনে হওয়া অস্বাভাবিক না। কোনো সিদ্ধান্তেই তিনি বেশিক্ষণ অটল থাকতে পারতেন না, ঋতুবতী অষ্টাদশীদের মতো মুহূর্তে-মুহূর্তে তার মেজাজ-মর্জি পরিবর্তিত হতো। তিনি সকালে বলতেন বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটে আছি, বিকেলে বলতেন আওয়ামি লিগের চৌদ্দ দলীয় মহাজোটে আছি, রাতে বলতেন– জাতীয় পার্টি কারো মুখাপেক্ষী না, আমরা এককভাবে পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। পৃথিবীতে তিনি সেই বিরল সামরিক শাসকদের একজন– পতনের পরও যিনি রাজনীতিতে বহাল তবিয়তে রাজত্ব করেছেন, নিজ দেশের রাজনীতিতে আমৃত্যু প্রাসঙ্গিক ছিলেন। কিন্তু মুহুর্মুহু মুডসুয়িং আর নজিরহীন নারীসম্ভোগের আড়ালে বরাবরই ঢাকা পড়ে যায় তার স্বাধীনতাবিরোধী কুৎসিত কর্মকাণ্ড। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসনের যে সিলসিলা খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও জিয়াউর রহমান চালু করেছিলেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তা অব্যাহত তো রেখেছিলেনই; ক্ষেত্রবিশেষে ছিলেন আরো এক কাঠি বেশি সরেস। এরশাদ-আমলের এই দিকটা অনুল্লিখিতই থেকে যায়, অনুল্লিখিত থেকে যায় একাত্তরে এরশাদের রহস্যজনক ভূমিকার কথা। আওয়ামি লিগের সাথে আমৃত্যু জোটবদ্ধ থাকার কারণে এরশাদ এই দায়মুক্তিটা পেয়ে থাকেন। বিএনপির পক্ষে কথা বললে নাস্তিকও হয়ে যায় তাত্ত্বিক গুরু, আওয়ামি লিগের পক্ষে কথা বললে আল-বদরও হয়ে যায় আল-আমিন।

১.

মুক্তিযুদ্ধকালে এরশাদের বয়স ছিল একচল্লিশ বছর, ছিলেন সপ্তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময়ে তিনি ছুটিতে নিজ এলাকা রংপুরেই ছিলেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে এপ্রিলের গোড়ার দিকে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও তিনি দুইবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। সেপ্টেম্বরে রংপুরে অসুস্থ পিতা মোহাম্মদ মকবুল হোসেনকে দেখতে এসেছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েও এরশাদ আবার চলে যান পাকিস্তানে। 'ষড়যন্ত্রের জালে বিপন্ন রাজনীতি' বইয়ে সাংবাদিক আবেদ খান লিখেছেন– 'তিনি (এরশাদ) এমন চাতুর্যের সঙ্গে তার ভূমিকা পালন করেছেন যে, কেউ কখনো যেন তাকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর এজেন্ট হিশেবে ধরতে না পারে। তিনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালনের সময়ে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে পাকিস্তানে আটক সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং ভারতবিরোধী কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করেন। তার ফলে স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে অবস্থানকারী এবং পাকিস্তানপ্রত্যাগতদের মধ্যে ভয়াবহ এবং আত্মঘাতী বিভাজন শুরু হয়।'

মুক্তিযুদ্ধকালে ও মুক্তিযুদ্ধপরবর্তীকালে এরশাদ পাকিস্তান থেকে গ্রামের বাড়ি রংপুরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী পাঠাতেন। তিনি ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে অন্তত চারবার বিমানযোগে বিভিন্ন সামগ্রী পাকিস্তান থেকে রংপুরে তার বাড়িতে পাঠান, যদিও তখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নিয়মিত বিমানচলাচল ছিল না। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ভাড়া করা অনিয়মিত বিমানে করে এরশাদ সেসব সামগ্রী বাড়িতে পাঠাতেন। আটকে-পড়া বাঙালি সেনাকর্মকর্তারা তখন পাকিস্তানে বিভিন্ন বন্দিশিবিরে নানান রকম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, আটকে-পড়া ১২০০ সেনাকর্মকর্তার মধ্যে আর কেউ এমন সুবিধা পাননি। এই পরিস্থিতিতেও এরশাদের এমন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তি ইঙ্গিত দেয়– তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর' বইয়ে কর্নেল শাফায়াত জামিল (বীরবিক্রম) ধারণা করেছেন– এরশাদ ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান গোয়েন্দাসংস্থা আইএসআইয়ের (ইন্টার-সার্ভিসেস

ইন্টেলিজেন্স) আশীর্বাদপুষ্টদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। বিমানযোগে রংপুরে চারবার মূল্যবান জিনিসপত্র পাঠানোর তথ্যও এই বই থেকেই নেওয়া।

আরেকটা বিস্ময়কর তথ্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধে রংপুর ছিল ৬ নম্বর সেক্টরের অধীন। **১৯৭১** সালের সেপ্টেম্বরে এরশাদ রংপুরের বাসভবনেই ছিলেন। সেক্টর ৬-এর কমান্ডার এমকে বাশার-সহ সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন এরশাদকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানানোর জন্য রংপুরে একজন প্রতিনিধি পাঠানো হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো– এমন কাউকে পাঠাতে হবে; যিনি এরশাদের বাড়ি চেনেন, চেনেন রংপুর শহরটাকেও, যিনি এরশাদকে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, মুক্তিযুদ্ধে তার (এরশাদের) যোগদানের গুরুত্ব বোঝাতে পারবেন। বাইশ বছর বয়সী ছাত্রনেতা, বিএলএফ কমান্ডার খন্দকার মুখতার এলাহি এই দায়িত্ব পেলেন। মুখতার ছিলেন এরশাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। কারমাইকেল কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত ভিপি, বক্তা ও কবি হিশেবে তৎকালীন রংপুরে মুখতারের জনপ্রিয়তা ছিল। সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে মুখতার রংপুরে যান, সঙ্গে থাকা মুক্তিযোদ্ধাসহ রংপুর শহরে আত্মগোপন করেন, কিন্তু কয়েক দফা চেষ্টা করেও এরশাদের সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হন (আগেই উল্লেখ করেছি– অসুস্থ পিতার দেখভাল করার জন্য এরশাদ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে ছিলেন)। এরশাদ দেখা দিতে রাজি হননি (তথ্যসূত্র– 'উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়', আখতারুজ্জামান মণ্ডল, প্রকাশকাল ১৯৯০)। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে এরশাদ যথারীতি পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা চেষ্টা করেও এরশাদকে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে নামাতে পারেননি।

মুখতার ইলাহিকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে মুখতারের ভাই মউদুদ ইলাহির সম্পাদিত একটা বইয়ের সন্ধান পেলাম, নাম– 'শহিদ কে. মুখতার ইলাহি এবং রংপুরে মুক্তিযুদ্ধ'। বইটা থেকে যা জানতে পারলাম, তা হলো– মুক্তিযুদ্ধের পর, শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে, রংপুর শহরের প্রধান সড়কের নাম রাখা হয় 'শহিদ মুখতার ইলাহি সরণি'। পনেরোই আগস্টের পটপরিবর্তনের পর সড়কটির সাইনবোর্ড থেকে মুখতার ইলাহির নাম ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের আগে সড়কটির নাম ছিল স্টেশন রোড। এরশাদের আমলে সড়কটি ফের স্টেশন রোড নামেই পরিচিতি

পায়, সড়ক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান মুখতার। মুখতারের সমাধি আড়াল করার জন্য বিএনপির আমলে, ১৯৯৫ সালে, সেখানে একটি টিনশেড হাই স্কুল (আইরখামার নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়) নির্মাণ করা হয়; বীভৎস ব্যাপার হলো– মুখতার ইলাহির কবর থেকে কয়েক ফুট দূরে স্থাপন করা হয় দুটো গণশৌচাগার। ঐ হাই স্কুলে কখনও কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি, কোনো শিক্ষার্থীও ভর্তি করা হয়নি। অর্থাৎ সেরেফ মুখতার ইলাহির কবরটাকে লোকচক্ষুর আড়াল করার জন্য এবং এই কবরের পাশে গণশৌচাগার বসিয়ে তাকে অসম্মানিত করার জন্যই সেখানে একটা ভুয়া স্কুল নির্মাণ করা হয়। সেই জোড়া-শৌচাগার ও টিনশেড ভবন এখনও আছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার মরণোত্তর অসম্মান নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগে যেখানে এত এলাহি আয়োজন, সেখানে বুঝতে আর বাকি থাকে না– মুখতার ইলাহির ওপর কার ক্ষোভ কোথায়।

২.

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশে যখনই কোনো ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে; দশদিক থেকে অত্যুৎসাহী মানবাধিকারকর্মীরা হায়-হায় করে উঠেছেন, বিচারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে জগৎজুড়ে মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, অতীত ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মুহুর্মুহু মোটিভেশনাল স্পিচ দিয়েছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো– একাত্তরে পাকিস্তানে আটকে-পড়া বাঙালি সেনাকর্মকর্তাদের বিচারের জন্য পাকিস্তান সরকার ট্রাইবুনাল গঠন করেছিল; এর বিরুদ্ধে বিশ্বের কোনো মানবাধিকার-সংস্থা তখন রা-শব্দ করেনি, যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে থাকা এ-দেশীয় দালাল বুদ্ধিজীবীরাও টুঁ-শব্দ করেননি। বাংলাদেশ যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একশো পঁচানব্বইজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের শক্ত দাবি তোলে, পাকিস্তান তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা দেয় ঐ একশো পঁচানব্বই পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হলে পাকিস্তান সে-দেশে আটকে পড়া বাঙালি সেনাকর্মকর্তাদেরও বিচার করবে। ঘোষণা দিয়েই পাকিস্তান থেমে থাকেনি। পাকিস্তানে কর্মরত যেসব বাঙালি সেনাকর্মকর্তা একাত্তরে বাংলাদেশে আসার জন্য সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, তাদের বিচারের জন্য পাকিস্তান সরকার ট্রাইবুনাল গঠন করে বসে। শুধু তা-ই না, পাকিস্তানে আটকে পড়া চার লাখ সাধারণ বাঙালিকেও

তারা জিম্মি করে। একাত্তরেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে– এমন ষোলো হাজার বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাকিস্তানত্যাগের ওপর তারা নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করে। বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যপ্রকাশকারী অসংখ্য বাঙালিকে তারা অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে বন্দি করে রাখে। একাত্তরের পর আফগানিস্তানের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে চাওয়া অনেক বাঙালি বেঘোরে প্রাণও হারিয়েছেন। বাংলাদেশে ফেরত আসার জন্য যারা পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ভুট্টো সরকার মাথাপিছু এক হাজার রুপি পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল।

যা হোক, বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়া বাঙালি সেনাকর্মকর্তাদের বিচারের জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল, চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হলো– সেই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এই তথ্য পাওয়া যায় মেজর রফিকুল ইসলামের (বীরউত্তম) 'প্রতিরোধের প্রথম প্রহর' বইয়ে, একই লেখকের 'স্বৈরশাসনের নয় বছর' বইয়েও এই তথ্য মেলে। 'ষড়যন্ত্রের জালে বিপন্ন রাজনীতি' বইয়ে সাংবাদিক আবেদ খানও একই কথা লিখেছেন, একই দাবি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনও (কর্নেল তাহেরের ভাই)। এরশাদ অবশ্য এসব তথ্য অস্বীকার করেছেন। ২০১৪ সালে তিনি দাবি করেছেন, 'দুর্ভাগ্য– স্বাধীনতাযুদ্ধে আমি অংশ নিতে পারিনি। যুদ্ধ শুরুর মাত্র এক মাস আগে আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়। যদি দেশে থাকতাম, তা হলে জীবন বাজি রেখেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতাম। যুদ্ধের সময়ে এবং স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানে স্ত্রীসহ বন্দি ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক সাফল্যে আমরা দেশে ফিরতে পেরেছি।'

কিন্তু একাত্তরের এপ্রিলে বাংলাদেশত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধকালে অসুস্থ পিতাকে দেখতে রংপুরে আগমন, রংপুরে পরিবারের সদস্যদের জন্য বিমানযোগে নজিরবিহীনভাবে উপহারসামগ্রী পাঠানো– ইত্যাকার তথ্য প্রমাণ করে না এরশাদ একাত্তরে পাকিস্তানের বন্দিশিবিরে ছিলেন। বরং প্রমাণ করে– একাত্তরে পাকিস্তানে তিনি মুক্ত পরিবেশেই ছিলেন এবং পাক সরকারের আশীর্বাদধন্য ছিলেন। পাকিস্তানের দোসর না হলে কোনো বাঙালি সেনাকর্মকর্তার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালে নির্বিঘ্নে নিজ বাড়িতে আসা বা থাকা

সম্ভব ছিল না। এরশাদ সত্যবাদী ছিলেন– ইতিহাস ঘেঁটে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ কেউ হাজির করতে পারবে বলে মনে হয় না। আইয়ুব খানের আমলে এরশাদ নিশান-ই-পাকিস্তান খেতাব পেয়েছিলেন (খেতাবপ্রাপ্তির কারণ বা সাল সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানতে পারিনি)। রাষ্ট্রপতি থাকাকালেও এরশাদ এই খেতাব ব্যবহার করতেন। এতে পাকিস্তানের প্রতি তার আকণ্ঠ আনুগত্যই প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রপতি থাকাকালেও এরশাদের নিশান-ই-পাকিস্তান খেতাব-ব্যবহার অব্যাহত রাখার কথা জেনেছি ২০১৯ সালের ১৬ জুলাই 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'এরশাদ-চরিত্রের একটি মূল্যায়ন' কলামে। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানে আটকে-পড়া বাঙালি কর্মকর্তাদেরকে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে সম্মত হয় পাকিস্তান সরকার। সেই দফায় অন্য সবার মতো এরশাদও বাংলাদেশে ফেরেন। একাত্তরে পাকিস্তান থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে এসে যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা বাংলাদেশে ফেরেননি বা যুদ্ধ শুরুর পর বাংলাদেশ থেকে উলটো পাকিস্তানে চলে গেছেন– এমন কর্মকর্তাদেরকে, খুব স্বাভাবিকভাবেই, স্বাধীন বাংলাদেশে চাকরিচ্যুত করা হয়। জনা পঞ্চাশেক কর্মকর্তাকে এ-কারণে চাকরি হারাতে হয়। চাকরি হারান এরশাদও।

এরশাদের অসংখ্য উপপত্নীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন মরিয়ম মমতাজ মেরি। গোপনে বিয়ে করলেও মেরিকে এরশাদ কখনও প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেননি। এর প্রতিশোধস্বরূপ মরিয়ম এরশাদের দুর্নীতির ইতিবৃত্ত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। ১৯৮৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় মেরির একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন– 'এরশাদ মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। সে আমার কাছে আসত, এসে নিজের নানান সমস্যা নিয়ে কান্নাকাটি করত। মুক্তিযোদ্ধা ছিল না বিধায় এরশাদকে কেউ বিশ্বাস করত না। ও ছিল সেরেফ একজন পাকিস্তানপ্রত্যাগত কর্মকর্তা। পাকিস্তানপ্রত্যাগত অনেক কর্মকর্তাকে বাংলাদেশে শাস্তির মুখোমুখিও হতে হয়েছিল। সবাই ওকে পাকিস্তানের এজেন্ট বলে সন্দেহ করত, বলত– ও বাংলাদেশের জন্য কাজ করেনি, সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে দেশের সাথে ও গাদ্দারি করেছে। ওর সাথের অনেক কর্মকর্তাই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তা হলে ও কেন দেয়নি?

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ওর পোস্টিং ছিল ভারত-সীমান্তের সাথে লাগোয়া। চাইলে সে পায়ে হেঁটেই সীমান্ত পাড়ি দিতে পারত। সে তা করেনি, সেজন্যই সবাই তাকে সন্দেহ করে।' মুক্তিযুদ্ধপরবর্তীকালে এরশাদের চাকরি নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে মেরি ঐ একই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন– 'মুক্তিযুদ্ধের পরপরই শেখ মুজিব এরশাদকে চাকরিচ্যুত করেন এবং বলে দেন এরশাদকে তিনি বাংলাদেশে দেখতে চান না। কিন্তু জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবকে বলেন– এরশাদ সিনিয়র কর্মকর্তা, তাকে বাংলাদেশ থেকে বের করে দিলে সেনাবাহিনীতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। এরশাদ এভাবেই বেঁচে যায়। কিন্তু মুজিব অনড় ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি এরশাদের চেহারাটাও দেখতে চান না।'

আর মেজর রফিকুল ইসলামের ভাষ্যমতে– 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এরশাদ বাংলাদেশে ফেরত আসেন এবং চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী ও কুড়িগ্রামের আওয়ামি লিগ-নেতা রিয়াজউদ্দিন মিয়া একদিন সন্ধ্যায় এরশাদকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরিয়ে এর ওপর একটি মুজিব কোট পরিয়ে তার হয়ে তদবিরের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন– আমার ভাগনের চাকরিটা না থাকলে যুদ্ধ করে আমার কী লাভ হলো! এ কথা বলার সাথে-সাথে এরশাদ শেখ মুজিবের পা ছুঁয়ে সালাম করেন। শেখ মুজিব এতে খুশি হয়ে তাকে চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেন।' অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের পা ধরে চাকরি রক্ষা করেছেন– এরশাদ সম্পর্কে এ ধরনের সাক্ষ্যও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

৩.

সেনাবাহিনীর যে কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বাংলাদেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও যেসব সেনাকর্মকর্তা বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেননি বা যুদ্ধ শুরুর পর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে সেনাকর্মকর্তারা বাংলাদেশে ফিরে যুদ্ধ করেননি; ১৯৭৩-পরবর্তী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে, খুব স্বাভাবিকভাবেই, এই দুই শ্রেণির সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব ছিল। মুক্তিযোদ্ধা ও অ-মুক্তিযোদ্ধারা একই বাহিনীতে একইসাথে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারবেন না– এটিই অনিবার্য। দ্বন্দ্বের

অন্যতম কারণ– স্বাধীন বাংলাদেশে এক সরকারি আদেশে সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অ-মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হয়, যা পাকিস্তানফেরত কোনো সেনাসদস্য মেনে নিতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতাকে এরশাদ সেনাসদরের ১৯৭৩-পরবর্তী প্রথম কনফারেন্সে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবদ্দশায়ই এরশাদ মুক্তিযোদ্ধা ও অ-মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্যদের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে সংঘাত সৃষ্টি করেন। জিয়াউর রহমানের আমলে প্রথমে উপ-সেনাপ্রধান হওয়ার পর এরশাদ জিয়ার যোগসাজশে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদেরকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদ থেকে সরিয়ে দেন এবং তাদের অধিকাংশকে বদলি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন। এরই ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অ-মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়। বিভিন্ন সেনাকর্মকর্তা লিপ্ত হন বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে।

৪.

জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর এরশাদ জিয়াহত্যার বিচারের নামে এক ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতে ওঠেন। জিয়াহত্যার বিচারের নামে তিনি সেনাবাহিনীতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জোরপূর্বক চাকরি থেকে অব্যাহতি দেন, প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডও দেন। উল্লেখ্য– জিয়াহত্যার সময়ে এরশাদ ছিলেন সেনাপ্রধান। জিয়াহত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে জেনারেল এমএ মঞ্জুরকে হত্যা করা হয়। বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মঞ্জুর ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার। এরশাদ মঞ্জুরহত্যামামলার প্রধান আসামি ছিলেন। জিয়াহত্যার সুযোগে এরশাদ ও কিছু অ-মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তা পাকিস্তানপ্রত্যাগত মেজর জেনারেল সামাদকে সভাপতি করে প্রহসনমূলকভাবে মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তা ছাঁটাই করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের মাধ্যমে আরও প্রায় ষাটজন মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তাকে বিভিন্ন অজুহাতে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়। অদ্ভুত বিষয় হলো– এসব মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাকে কেন এভাবে নাজেহাল করা হলো, পরবর্তী সরকারগুলো সে-ব্যাপারে তদন্তের আগ্রহ দেখায়নি বা উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের

চাকরিপ্রদানও অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এসব তথ্য জেনেছি মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য' বই থেকে। মোদ্দা কথা– পাকিস্তানফেরত সেনাকর্মকর্তা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানীকরণের কাজেই লিপ্ত ছিলেন, তিনি সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশদের মতো 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি বাস্তবায়ন করে নিজের আখের গুছিয়েছেন। একাত্তরে বা ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত এরশাদ এমন কিছু করেননি– যা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যায়।

এরশাদ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান এরশাদকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধানের পদে বসিয়েছিলেন। জিয়াহত্যার পর, ক্ষমতায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে, সমর্থন আদায়ের জন্য সেনাপ্রধান এরশাদ সামরিক বাহিনীর বেতন-ভাতা দুইবার বৃদ্ধি করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের এক সভায় বক্তৃতাকালে নিজেকে তিনি মুক্তিযোদ্ধা বলে উল্লেখ করেন এবং এই বাবদ তার তাঁবেদাররা তৎক্ষনাৎ তাকে 'রণবীর' উপাধি দেয় (তথ্যসূত্র– 'স্বৈরশাসনের নয় বছর', মেজর রফিকুল ইসলাম)। বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম, বীরপ্রতীক বা বঙ্গবীর খেতাব জোটানো যেহেতু কোনোভাবেই সম্ভব না; সেহেতু এরশাদ নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন 'রণবীর' খেতাব। চাটুকাররা তাকে পল্লিবন্ধু উপাধিও দিয়েছিল। তিনি হয়তো শেখ মুজিবুর রহমানের 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবের আদলে মোসাহেবদেরকে দিয়ে নিজের জন্য 'পল্লিবন্ধু' খেতাব তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

৫.

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদেরকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। এদেরকে দ্বিতীয় সর্বাধিক সুবিধা দিয়েছেন এরশাদ। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত না হলে জিয়া কোনোভাবেই রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন না, জিয়া রাষ্ট্রপতি না হলে এরশাদেরও কখনও রাষ্ট্রপতি হওয়া হতো না। এরশাদের ক্ষমতাসীন হওয়া ছিল মুজিবহত্যারই ধারাবাহিকতা মাত্র। ফলে, জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভার মতো এরশাদের মন্ত্রিসভাও ছিল রেজাকারদের কলকাকলিতে মুখরিত। এরশাদের মন্ত্রিসভা জিয়ার মন্ত্রিসভার মতোই যুদ্ধাপরাধীদের প্রকৃষ্ট পুনর্বাসনকেন্দ্র। এরশাদ-মন্ত্রিসভার সবচেয়ে কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল

মান্নান। পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসাশিক্ষক সমিতির সভাপতি হিশেবে মাদ্রাসাশিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মান্নান জেনারেল নিয়াজির সাথে দেখা করেন। নিয়াজিকে এক কপি কোরান উপহার দিয়ে মান্নান বলেছিলেন– 'পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমরা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' এই বৈঠকের পর মাদ্রাসাশিক্ষক ও ছাত্রদেরকে রেজাকার, আল-বদর ও আশ-শামসে অন্তর্ভুক্ত করে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মান্নান-সংক্রান্ত উল্লিখিত তথ্যের উৎস 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' বইয়ের পৃষ্ঠা ৮৮-৯০।

বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছিল, তখন ইনকিলাবকে দিয়ে এরশাদ একটা গুজব রটিয়ে দেশে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করেন, যাতে দাঙ্গা-দমনের দোহাই দিয়ে দেশজুড়ে ধরপাকড় করা যায়। ভারতের কট্টর হিন্দুদের একটা দল ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙার চেষ্টা করেছিল ঠিকই। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। ওদিকে ইনকিলাব পত্রিকা পরেরদিন প্রথম পাতায় আট কলামে ইচ্ছেকৃতভাবে রিপোর্ট করে যে, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। এর পর এরশাদ নিজস্ব বাহিনী দিয়ে দেশব্যাপী দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করলেও দাঙ্গা খুব-একটা বাঁধেনি। রিপোর্টের একদিন পর এরশাদ লোক-দেখানোর জন্য ইনকিলাব পত্রিকার ডিক্লেয়ারেশন বাতিল করেন, পরে আবার ফেরতও দেন। এভাবেই একটা সম্ভাব্য দাঙ্গার অকাল গর্ভপাত ঘটে। আবদুল মান্নান মুক্তিযুদ্ধকালে যেমন মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন, তেমনি নব্বইয়েও নিজের পত্রিকার মাধ্যমে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করে সংখ্যালঘুদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ নামিয়ে আনার পাঁয়তারা করেছেন।

চট্টগ্রামের কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কৃতকর্মের কথা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কটাক্ষ করে খোদ স্বাধীন বাংলাদেশে বসেই সালাউদ্দিন যত কথা বলেছেন; তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো যুদ্ধাপরাধীও বলেছেন কি না– সন্দেহ আছে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। সালাউদ্দিন জিয়াউর রহমানের আমলে সাংসদ হয়েছেন, খালেদা জিয়া

তাকে নিজের সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা বানিয়েছেন এবং ওআইসির মহাসচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন দিয়েছেন, আর এরশাদ তাকে দিয়েছেন মন্ত্রিত্ব। সালাউদ্দিন ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি থেকে সাংসদ হয়েছিলেন। এরশাদ সালাউদ্দিনকে তিনবার তিন মন্ত্রণালয় দিয়েছেন– ত্রাণ ও পুনর্বাসন, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ।

১৯৭১ সালে অর্ধসহস্রাধিক স্বাধীনতাবিরোধীকে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় 'কায়সার বাহিনী' গঠন করেন তৎকালীন মুসলিম লিগ-নেতা সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার। তিনি নিজে ছিলেন বাহিনীপ্রধান। এই বাহিনী হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট, মাধবপুর, নাসিরনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সাথে যুক্ত ছিল; গ্রামের নারীদেরকে অপহরণ করে পাঠিয়ে দিত সেনা ক্যাম্পে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর কায়সার পালিয়ে লন্ডনে চলে যান। দেশে ফেরেন শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর। জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৮ সালে আবারও রাজনীতিতে সক্রিয় হন কায়সার। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সিলেট-১৭ আসন থেকে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিশেবে সাংসদ হন। পরে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন এবং জিয়া তাকে হবিগঞ্জ বিএনপির সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত করেন। জিয়া তাকে সংসদের হুইপও বানিয়েছিলেন। একপর্যায়ে কায়সার জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন এবং হবিগঞ্জ শাখার সভাপতির দায়িত্ব পান। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৪ আসন থেকে জাতীয় পার্টির মনোনয়নে তিনি দুই দফা সাংসদ হন। এর পর তাকে কৃষিপ্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। জিয়াউর রহমানের হুইপ ও এরশাদের কৃষিপ্রতিমন্ত্রী কায়সারকে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত' মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধের দায়ে ২০১৪ সালে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে তিনি ২০২২ সালে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

একাত্তরে ঠাকুরগাঁওয়ের মির্জা রুহুল আমিন ছিলেন পাকবাহিনীর সহযোগী। যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের অভিযোগে বাহাত্তরের দালাল আইনে সাঁইত্রিশ হাজার দালালের সাথে তিনিও গ্রেপ্তার হন। ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ দালালদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ– এই চার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের সাথে সম্পৃক্তদের

জন্য ‘সাধারণ ক্ষমা’ প্রযোজ্য ছিল না। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ছাব্বিশ হাজার দালাল মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে গেলেও এগারো হাজার দালাল কারাগারেই বন্দি ছিল। মির্জা রুহুল আমিন সাধারণ ক্ষমা না-পাওয়া সেই এগারো হাজারের একজন। ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করে সবাইকে মুক্ত করে দেন, সেই সুবাদে কারাগার থেকে ছাড়া পান রুহুল আমিনও। ১৯৭৯ সালে জিয়ার আমলে দিনাজপুর-৪ থেকে ও এরশাদের আমলে ১৯৮৮ সালে ঠাকুরগাঁও-২ থেকে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। দালাল আইনে জেল-খাটা রুহুল আমিনকে এরশাদ তিনবার তিন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বানিয়েছিলেন– কৃষি, সমাজকল্যাণ এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ। উল্লেখ্য মির্জা রুহুল আমিন (ডাকনাম চোখা মিয়া) বিএনপির বর্তমান মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের বাবা।

গোলাম আজমকে জামায়াতে ইসলামির আমির ঘোষণার প্রতিবাদে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে গড়ে ওঠে গণআদালত। ১৯৯৩ সালে প্রথম বর্ষপূর্তিতে গণআদালত আটজন যুদ্ধাপরাধীর নাম ঘোষণা করেন– আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, মো. কামারুজ্জামান, আবদুল আলিম, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মওলানা আবদুল মান্নান, আবদুল কাদের মোল্লা ও আনোয়ার জাহিদ। সাংবাদিক-নেতা জাহিদ মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে বিএনপি-গঠন ও এর ঘোষণাপত্র তৈরিতে তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন, খালেদা জিয়া তাকে বানিয়েছিলেন নিজের তথ্য-উপদেষ্টা। আর ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়নে সাংসদ হওয়ার পর এরশাদ তাকে বানিয়েছিলেন মন্ত্রী। আনোয়ার জাহিদ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন দুইবার– একবার ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে, আরেকবার ১৯৮৩ সালে এরশাদের আমলে। এরশাদ অন্তত দশজন স্বাধীনতাবিরোধীকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়েছিলেন।

৬.

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদেরকে পুরস্কৃত করার যে ধারা খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান শুরু করেছিলেন; এরশাদ সেই ধারাকে অবিশ্বাস্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যোগ করেছিলেন নজিরবিহীন মাত্রা। শেখ মুজিবের খুনিরা ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের সেনাবিদ্রোহের পর

প্রাণভয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি দিলেও ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় জিয়া তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনেননি। কেননা যে খুনিচক্র শেখ মুজিবকে সপরিবার নির্মূল করে দিতে পেরেছে, জিয়াকেও নিকেশ করে দেওয়া তাদের জন্য কঠিন কিছু না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের প্রতি প্রেমপ্রদর্শনে এরশাদ জিয়াকে ছাড়িয়ে যোজন-যোজন দূরে চলে গিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের স্বঘোষিত খুনিদের একাংশকে এরশাদ বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে পদোন্নতি দেন এবং একাংশকে নিজ দায়িত্বে ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এরশাদ-সরকার ও গোয়েন্দাসংস্থার সহযোগিতায় তারা প্রগশ (প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি) নামে একটা রাজনৈতিক দলও গঠন করেন (তথ্যসূত্র– ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর প্রথম আলোয় মতিউর রহমানের লেখা নিবন্ধ– 'খুনিচক্রকে রক্ষা করেছে জিয়া-এরশাদ-খালেদা সরকার')। শিউরে ওঠার মতো ব্যাপার হলো– শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি সৈয়দ ফারুক রহমান ও খন্দকার আবদুর রশিদ এরশাদের আমলে, ১৯৮৫ সালে, প্রকাশ্যে 'পনেরোই আগস্ট বিপ্লবের আদর্শ বাস্তবায়ন কমিটি' গড়ে তোলেন এবং এই কমিটির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এত বড় স্পর্ধা দেখানোর সুযোগ ফারুক-রশিদকে এরশাদই করে দিয়েছিলেন।

লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মর গাদ্দাফির অর্থায়নে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ফারুক-রশিদ হোটেল শেরাটনে ১৯৮৭ সালের ৩ আগস্ট 'ফ্রিডম পার্টি' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। আওয়ামি লিগ-বিএনপি ও উল্লেখযোগ্য সব রাজনৈতিক দল ১৯৮৮ সালের নির্বাচন বর্জন করে। সেই একতরফা নির্বাচনে এরশাদ ফ্রিডম পার্টিকে দুইটি আসনে বিজয়ী করে আনেন এবং দলটিকে জাতীয় সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিন আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ছিল জাসদ (সিরাজ)। এর মাধ্যমে এরশাদ অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে এই বার্তা দেন যে, অন্যান্য দল নির্বাচনে না এলেও তার পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব, বিরোধীদলও গঠন করানো সম্ভব। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে মনে হয়– একটা বিকল্প বিরোধীদল সৃষ্টি করে আওয়ামি লিগ-বিএনপিকে রাজনীতি থেকে বিয়োগ করে ফেলাই ছিল এরশাদের ফ্রিডম পার্টি-সৃষ্টির নেপথ্য কারণ। ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও ফারুককে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন এরশাদ। প্রয়াত সাংবাদিক মিজানুর রহমান খানের

ভাষ্য অনুযায়ী– ‘খুনি ফারুক নিশ্চয়ই এরশাদকে হারাতে প্রার্থী হননি। এটা ছিল রাজনৈতিকভাবে তার পুনর্বাসিত হওয়ার, পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশের মাটিতে তারই গড়া রাজনৈতিক দলের জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে অনুপ্রবেশের ইচ্ছাপূরণ।’ ইতিহাসের এক কুৎসিত সত্য হচ্ছে– শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিরা এরশাদের হাত ধরেই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। শেখ মুজিবের খুনিদেরকে যে সুযোগ এমনকি জিয়াও দেননি, সেই সুযোগ দিয়েছিলেন এরশাদ। বাংলাদেশে শেখ মুজিবের খুনিদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের রূপকার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে করুণা করে সেনাবাহিনীতে যে এরশাদের চাকরি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি হয়ে সেই এরশাদ সেই করুণার প্রতিদান এভাবেই দিয়েছিলেন।

৭.

মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবিতার কথা সচেতন পাঠকমাত্রেরই জানা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের লক্ষ-লক্ষ শরণার্থী খুলনা থেকে ‘যশোর রোড’ হয়ে পদব্রজে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমাতেন। যশোর রোড পরিদর্শন করে শরণার্থীদের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তিনি কবিতাটা লিখেছিলেন। অর্থাৎ যশোর রোড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মুক্তিযুদ্ধকালে খুলনার খান আবদুস সবুর ছিলেন পাকিস্তান সরকারের শীর্ষস্থানীয় দালাল। তাকে খুলনায় হিন্দু গণহত্যার রূপকার বলা হয়। ১৯৭১ সালে ঢাকায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই মুসলিম লিগ-নেতা বলেন– ‘পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধলে তা বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেবে। ভারত পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করতে পারবে না বলেই পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনীর নামে পঞ্চম বাহিনী গড়ে তুলেছে। মুক্তিবাহিনী কাদের বিরুদ্ধে লড়ছে? দেশ তো মুক্ত।’ চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হলো– ‘একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়’ বই থেকে জেনেছি ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর রাগে-দুঃখে সবুর আত্মহননের চেষ্টা করেন। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়ে কোনো দালাল আত্মহননের চেষ্টা করেছেন– এমন ঘটনার কথা আর কোথাও শুনিনি। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

দালাল আইনে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। অভাবনীয় ব্যাপার হলো– এরশাদের আমলে, ১৯৮৪ সালে, খুলনার যশোর রোডের নাম রাখা হয় খান আবদুস সবুর সড়ক।

৮.

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ব্যক্তিগত কথোপকথনকালে লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মর গাদ্দাফি শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলাদেশকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' ঘোষণার জন্য। মুক্তিযুদ্ধে সৌদি আরব বাংলাদেশের সক্রিয় বিরোধিতা তো করেছিলই, স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে এমনকি হজে যাওয়ারও অনুমতি দেয়নি। অত্যন্ত বীভৎস ব্যাপার হলো সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিশেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, যেদিন মুজিব নিহত হন। মুজিবের ওপর সৌদি বাদশার আক্রোশ ছিল। ঐ একই সম্মেলনে সৌদি বাদশা ফয়সাল বিন আবদুল আজিজও শেখ মুজিবকে শর্ত দেন এই মর্মে যে, বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হলে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিশেবে স্বীকৃতিও দেবে, বাংলাদেশীদেরকে হজেও যেতে দেবে। শেখ মুজিবুর রহমান দুজনকেই বলেছিলেন যে, তাদের দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অমুসলমান না থাকলেও বাংলাদেশে এক কোটি অমুসলমান নাগরিক রয়েছেন, এক কোটি অমুসলমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন; সব ধর্মের অনুসারীদের সমান অংশগ্রহণে স্বাধীন হওয়া দেশকে, তাই, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা সম্ভব না। রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট একটা ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা মানে অন্য সব ধর্মের লোকজনকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিশেবে ঘোষণা করা, যা রাষ্ট্র কোনোভাবেই করতে পারে না। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়– পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এ-দেশীয় দোসররা যে গণহত্যা চালিয়েছিল, এর পেছনে বৃহত্তম অজুহাত হিশেবে তারা ধর্মকেই ব্যবহার করেছিল। তা ছাড়া, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের পিঞ্জর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা আরেকটা রাষ্ট্রও সেই একই রকমের ধর্মরাষ্ট্র হতে পারে না। এ থেকেই প্রমাণিত হয়– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঘোষিত স্তম্ভ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা।

১৯৭২ সালের আদি সংবিধানের দ্বাদশ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার কথাই উল্লিখিত ছিল। সংবিধানের চারটে মূল নীতিরও অন্যতম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিদায় করেন। তিনি অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করার দরকার বোধ করেননি। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক কাঠি বেশি সরেস হয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতা বিদায়ের এগারো বছর পর, ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সংযুক্ত করেন। বোঝাই যায়– ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে খুশি করার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধের অঘোষিত স্তম্ভের মূলে এই কুঠারাঘাত করেছিলেন। সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কোনো সরকারপ্রধান তখনই তোয়াজ করেন, যদি তার সরকারটা হয় অনির্বাচিত অথবা কারচুপির মাধ্যমে নিশিকালে নির্বাচিত। এরশাদের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো ছিল হাস্যকর রকমের এবং তিনি ক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বন্দুকের নল দেখিয়ে অবৈধভাবে। অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকা একজন মানুষের যা যা করা উচিত, তিনি তা-ই করেছিলেন; ধর্মের প্রতি মহব্বত থেকে এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম প্রণয়ন করেননি, এর পেছনে ছিল সেরেফ গদি টিকিয়ে রাখার রাজনীতি, তার রাষ্ট্রধর্ম ছিল রাজনৈতিক রাষ্ট্রধর্ম। তা ছাড়া, ব্যক্তি এরশাদ যে ধরনের জীবন যাপন করতেন, তাও ধর্মের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তৎকালীন জ্বালানি সচিব একেএম মোশাররফের স্ত্রী জিনাত মোশাররফের সাথে প্রকাশ্য পরকীয়ার প্রেক্ষিতে কিছু ধর্মীয় সংগঠন এরশাদের শাস্তিও দাবি করেছিল। এরশাদের উপপত্নী ছিল অগণিত। এ রকম অধার্মিক জীবন যাপন করা একজন বকধার্মিক সদিচ্ছা থেকে বা ধর্মপ্রেম থেকে রাষ্ট্রধর্ম প্রণয়ন করেছেন– এই রূপকথা বিশ্বাস করার কোনো জো নেই।

এরশাদের এই রাষ্ট্রধর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছিল বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল। শেখ হাসিনা একে 'ধর্মের রাষ্ট্রীয়করণ' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন সুযোগ পেলেই আওয়ামি লিগ ধর্ম-আইন বাতিল করবে। রাষ্ট্রধর্মপ্রণয়নকে খালেদা জিয়া অভিহিত করেছিলেন 'ধর্মের নামে জাতিকে বিভক্ত করার সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত' হিশেবে (তথ্যসূত্র– ৮ জুন ১৯৮৮, ইত্তেফাক)। বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব কেএম ওবায়দুর রহমান বলেছিলেন– 'চলমান আন্দোলনে বিভক্তি সৃষ্টি ও অগণতান্ত্রিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিল পাশ করা

হয়েছে।' এখন জেনে অবিশ্বাস্য লাগবে– সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিলের দাবিতে বিএনপি অর্ধবেলা হরতালও ডেকেছিল (তথ্যসূত্র– ১২ জুন ১৯৮৮, দৈনিক বাংলা)। লোমহর্ষক ব্যাপার হলো– এমনকি, ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামিও এরশাদের সেই রাষ্ট্রধর্মপ্রণয়ন মেনে নেয়নি। এক প্রেস নোটে জামায়াতে ইসলামি বলেছিল– 'সরকার তার নিজস্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এই বিল পাশ করেছে। সরকার তার গণবিরোধী কার্যকলাপ ঢাকা দেওয়ার জন্য ইসলামের নাম ব্যবহার করেছে। ইসলাম কায়েম সরকারের উদ্দেশ্য নয়, বরং ইসলামি আন্দোলনের অগ্রগতি প্রতিহত করাই তাদের উদ্দেশ্য (তথ্যসূত্র– ১০ জুন ১৯৮৮, দৈনিক বাংলা)।' মজার ব্যাপার হচ্ছে– ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে সভা ডেকেছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ। বলাই বাহুল্য– ঐ অংশটি ছিল এরশাদের টাকায় পোষা গৃহপালিত ক্লাব।

আওয়ামি লিগ সরকার ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনী সংবিধানে বাহাত্তরের ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। শেখ হাসিনা ১৯৮৮ সালে বলেছিলেন আওয়ামি লিগ সুযোগ পেলেই সংবিধান থেকে ধর্ম-আইন তুলে নেবে। ২০১১ সালে সুযোগ পেয়েও আওয়ামি লিগ সরকার সে-পথে পা বাড়ায়নি। কেননা, এটি সহজেই অনুমেয়– এখন সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বিদায় করলে দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে, অপরিমেয় রক্তপাতহেতু দেশে বেঁধে যেতে পারে গৃহযুদ্ধও। ১৯৮৮ সালে সব বিরোধীদল রাষ্ট্রধর্মের বিরোধিতা করলেও এখন তারাই রাষ্ট্রধর্মের প্রধান রক্ষক, রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করলে তারাই এখন যুদ্ধ ঘোষণা করে বসবে। সময়ের আবর্তনে ও বিবর্তনে রাজনীতি যে কতটা তীব্রভাবে একশো আশি ডিগ্রি বদলে যায়, এর প্রমাণ রাষ্ট্রধর্ম ইশুতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ১৯৮৮ সালের অবস্থান আর এখনকার অবস্থান। ভোল যে এরশাদ একা পালটাতেন, তা নয়; আজ এক ঢোল পিটিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘোল খাওয়ানোর জন্য আগামীকাল আরেক ঢোল পেটানোর মাধ্যমে রাজনৈতিক ঝোল খাওয়ার কাজটি বাংলাদেশের সবগুলো দলই করেছে। এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম প্রণয়ন করেছিলেন রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। তখন আওয়ামি লিগ, বিএনপি, জামায়াত রাষ্ট্রধর্মের বিরোধিতাও করেছিল রাজনৈতিক কারণেই। দুই ক্ষেত্রেই কাজ করেছে রাজনীতি। মধ্যখান দিয়ে স্থায়ী ক্ষতিটা হয়ে গেছে বাংলাদেশের। স্বৈরশাসক এরশাদ কায়েমি স্বার্থ হাসিল করার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম

নামক এমন জগদ্দল পাথর বসিয়ে রেখে গেছেন, যে পাথরটা গোটা বাংলাদেশেরই টুঁটি চেপে ধরে বসে আছে। এই পাথর সরানোর মতো বুলডোজার এখন আর কারো হাতেই নেই। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়ে জিয়াউর রহমান এবং সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সংযুক্ত করে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে গেছেন।

৯.

নিজের অবৈধ শাসনকালকে দীর্ঘায়িত করতে এরশাদ ধর্মকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছেন, আবার ছুড়ে ফেলেও দিয়েছেন। একেক শুক্রবার একেক মসজিদে হাজির হয়ে বলতেন যে, এই মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার কথা তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্তু তিনি কোন শুক্রবারে কোন মসজিদে যাবেন, তা নির্ধারণ করতেন গোয়েন্দাকর্মকর্তারা এবং তারা আগে থেকেই ঐ মসজিদ তল্লাশি করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রাখতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে সাধু সাজার জন্য তিনি সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার করেন, রেডিও-টেলিভিশনে আজান প্রচার শুরু করেন, প্রথম শ্রেণি থেকেই আরবি-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে ১৯৮৩ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোর বিদ্যুৎবিল মওকুফ করেন। ১৯৮৩ সালের ১৪ জানুয়ারি যুদ্ধাপরাধী আবদুল মান্নানের আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে এরশাদ বলেন– শহিদমিনারে এখন থেকে ফুল দেওয়া ও আল্পনা আঁকা চলবে না, কোরানখানি হবে (তথ্যসূত্র– 'স্বৈরশাসনের নয় বছর', মেজর রফিকুল ইসলাম)। যে ভাষা-আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ক্রমবিকশিত হয়েছে, সেই আন্দোলনের শহিদদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোকে 'বেদআত' বলতেও তার বিবেকে বাঁধেনি। সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের জুন মাসে। এরশাদ ১৯৮২ সালে ঘোষণা দেন যে, এই নির্মাণকাজ তিনি শেষ করবেন। কিন্তু স্মৃতিসৌধের মূল নকশা থেকে তিনি 'শিখা অনির্বাণ' বাদ দেন ধর্মানুভূতির ধুয়া তুলে (তথ্যসূত্র– 'বাংলাদেশী জেনারেলদের মন', মুনতাসীর মামুন)। এরশাদ কখন কোন জিনিশকে কী বলে আখ্যা দিয়ে বসেন– বস্তুত, এরই কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নীতিহীন একজন শাসক; যিনি না ঘরকা, না ঘাটকা। তবে, ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে সংখ্যাগুরু

সম্প্রদায়কে তুষ্ট রেখে এরশাদ যত যা-ই করেছেন; কিছুতেই কিছু হয়নি। খোদ ইসলামি দলগুলোও তার এই লোকদেখানো ধর্মপ্রেমকে নাটক মনে করত। শেষ পর্যন্ত সর্বদলীয় গণঅভ্যুত্থানের ফলে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদকে গদিচ্যুত হতে হয়, পরবর্তী অর্ধযুগ তার ঠাঁই হয় কারাগারে।

১০.

যুদ্ধাপরাধী আবদুল কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগে সৃষ্টি হয়েছিল গগনবিদারী গণজাগরণ। গণজাগরণকে দমন করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী সম্মিলিত শক্তি ‘হেফাজতে ইসলাম’ নামক একটি চট্টগ্রামভিত্তিক উগ্রবাদী সংগঠনকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল। হেফাজতকে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামি। ঐ বছরের এপ্রিলে এরশাদ সশরীর হেফাজতের সমাবেশে গিয়ে মৌলবাদীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, হেফাজতের মে মাসের সমাবেশে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করেছেন, দোয়া নেওয়ার জন্য একাধিকবার হাটহাজারিতে গিয়ে হেফাজতপ্রধান আহমদ শফির সাথে দেখা করেছেন। ক্ষমতায় থাকাকালেও এরশাদ এভাবে বহু পিরের আস্তানায় গিয়েছেন দোয়া চাওয়ার নামে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করার জন্য। এরশাদ ধারণা করেছিলেন হেফাজত একপর্যায়ে ভোটের রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠবে, হেফাজতই নির্ধারণ করবে– কারা গদিতে থাকবে, কারা গদিচ্যুত হবে। হেফাজতকে ব্যবহার করে ফের এককভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। এরশাদ সম্পর্কে এই নিবন্ধে যা-কিছু লিখেছি, এর প্রায় সবটুকুই বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা পড়ে-পড়ে লেখা। জন্মই নিয়েছি এরশাদপতনের মাত্র তিন বছর আগে। ফলে, রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলনামা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু হেফাজত ইশুতে অ-রাষ্ট্রপতি এরশাদের উদ্বাহু উল্লম্ফন স্বচক্ষেই দেখা। মুক্তিযুদ্ধকালেও তিনি পাকিস্তানের স্বার্থ হাসিল করেছেন, রাষ্ট্রপতি থাকাকালেও স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে পুনর্বাসন করেছেন, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও তিনি স্বাধীনতাবিরোধী হেফাজতের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ফের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিবাস্বপ্ন দেখেছেন। অর্থাৎ এরশাদজীবনের কোনো অংশই সাক্ষ্য দেয় না যে, তিনি স্বাধীনতার পক্ষের কেউ ছিলেন।

১১.

হত চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আক্ষরিক অর্থেই শেখ মুজিবুর রহমানের পা ধরেছেন, পদোন্নতি পাওয়ার জন্য বয়সে অনুজ জিয়াউর রহমানের মোসাহেবি করেছেন। চাকরি ফিরে পেয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা সংঘাত সৃষ্টি করেছেন, সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরিয়ে দিয়েছেন, বদলি করেছেন হিলট্র্যাক্টে। যে জিয়া এরশাদকে সেনাপ্রধান বানিয়েছেন, সেই জিয়াকেই হত্যার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়ে জিয়ার অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়েছেন এরশাদ। আবার ঐ জিয়াহত্যাকে পুঁজি করেই প্রহসনের বিচারে এরশাদ এগারোজন মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তাকে হত্যা করেন, যাতে কেউ তার ক্ষমতাদখলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না পারে। ক্ষমতা দখল করে তিনি যুদ্ধাপরাধীদেরকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়েছেন, দলে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছেন, যুদ্ধাপরাধীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দুয়ার উন্মোচন করে দিয়েছেন, সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের অন্তর্ভুক্তি অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, অতর্কিতে রাষ্ট্রধর্ম প্রণয়ন করে সংবিধানের মৌলিক শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। এরশাদ শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদেরকে বিদেশে পদোন্নতি দিয়েছেন, দেশে ফিরিয়ে এনে রাজনীতিতে নামিয়েছেন, নির্বাচনে জিতিয়ে এনে সংসদে বসিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংসদে তারই স্বঘোষিত খুনিরা বীরদর্পে বসে আছে– এই দৃশ্যের স্রষ্টা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। অর্থাৎ নষ্টামির এমন কোনো অঙ্গন নেই, যে অঙ্গনে এরশাদের পদচারণা ছিল না। আওয়ামি লিগ-বিএনপি দুই দলই আবার এই এরশাদকেই জোটে পাওয়ার জন্য মরিয়া ছিল। দুই দলকে এরশাদ যাবজ্জীবন সেরেফ নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন।

পঁচাত্তর থেকে একানব্বই– বাংলাদেশের এই ষোলো বছর আমাদের সমসাময়িক প্রজন্মের কাছে বরাবরই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। এই ‘ষোলো’ সম্পর্কে যত জানছি; বিস্ময়ে বিমূঢ় হচ্ছি, বেমালুম বাকরুদ্ধ হচ্ছি, কাটাচ্ছি বিনিদ্র বিমূর্ত রাত। আলোচ্য ষোলো বছরে বাংলাদেশে যা-কিছু ঘটেছে, রীতিমতো রূপকথার মতো। এই সময়ে কে যে কখন কাকে হত্যা করেছে, কে যে কখন ক্ষমতা দখল করেছে, আবার পালটা অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে– এর কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ঠিকানা তবুও খুঁজে বের করার চেষ্টায় মত্ত আছি। অজস্র দলিলদস্তাবেজ ঘেঁটে চেষ্টা করছি সর্বোত্তম ঠিকানাগুলো আবিষ্কার করতে, নিজে জানতে, অন্যদেরকে জানাতে। বাংলাদেশের

এখনকার রাজনৈতিক রাহাজানি আর মুষলধার মতানৈক্যের পেছনে আছে পঁচাত্তর থেকে একানব্বইয়ের একান্নবর্তী ইতিহাস। এই ইতিহাস সম্পর্কে না জানলে, এই ইতিহাসের ফায়সালা না করলে, এই ইতিহাসের মীমাংসা না হলে দেশে কেবল উড়ালসেতু-উন্নয়নই হবে; জাতির মানসিক মুক্তি মিলবে না, দেশকে আবার গিলবে অভ্যুত্থান পালটা-অভ্যুত্থান, দেশে আবার নেমে আসবে জলপাই-রঙা অন্ধকার। মানসিক মুক্তির জন্য চাই ইতিহাসের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কাদেরকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন, ক্ষমতা দখল করে কাদেরকে হত্যা আর কাদেরকে পুনর্বাসন করেছেন, কাদের ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন আর কাদের সাথে রসলীলা-রঙ্গ করেছেন, পতনের পর এরশাদকে কারা পুনর্বাসন করেছেন, কেন বাংলাদেশের বড় দুই দল একজন পতিত স্বৈরাচারকে রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক-অপাঙক্তেয় করে রাখল না; এরও মীমাংসা হতে হবে, ইতিহাসের কাঠগড়ায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে হবে এরশাদ পুনর্বাসন-মামলার।

আখতারুজ্জামান আজাদ
স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে
বিএনপি-আওয়ামি লিগ-জাতীয় পার্টির ভূমিকা

বিএনপি স্বাধীনতার কোন পক্ষের দল?

২৬-২৮ আগস্ট ২০২৩

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী পুনরায় অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু করে, দেশের শীর্ষপর্যায়ে পুনঃপ্রবর্তিত হতে থাকে পাকিস্তানি ভাবধারা, ফাঁকফোকরে লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতাবিরোধীরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। শাসকরাও স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা শুরু করেন। সদ্যস্বাধীন দেশে একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারাই কোণঠাসা হয়ে পড়েন, বীরদর্পে দেশজুড়ে দবদবিয়ে হাঁটতে থাকে স্বাধীনতার সক্রিয়-সশস্ত্র বিরোধিতা করা দেশীয় দোসররা। এই পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া শুরু করেন সাবেক আওয়ামি লিগ-নেতা ও মুজিব-মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ। মোশতাক ক্ষমতায় ছিলেন তিরাশি দিন। এই ক'দিনেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন, বাংলাদেশকে সিকি-পাকিস্তান বানিয়ে ফেলেন। 'জয় বাংলা' স্লোগান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে মোশতাক 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর আদলে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান নির্ধারণ করেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', বাংলাদেশ বেতারের নাম বদলে 'রেডিও পাকিস্তান'-এর আদলে নাম রাখেন 'রেডিও বাংলাদেশ', বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক প্রবর্তন করেন পাকিস্তানি পোশাকের অনুকরণে। শেখ মুজিবুর রহমান যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, সেহেতু তাকে হত্যা করার পর পরবর্তী শাসকরা বাংলাদেশকে একাত্তরপূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মোশতাকের হাত ধরে।

বারো সপ্তাহ রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার পর খন্দকার মোশতাক সামরিক অভ্যুত্থানে গদিচ্যুত হন। ব্যাপক রক্তক্ষয়ী চড়াই-উতরাইয়ের পর ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন, তাকে এই দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয় ১৯৭৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। সায়েমের শাসনকালের পুরোটা সময়জুড়ে সেনাপ্রধান ছিলেন জিয়াউর রহমান। তখন সায়েম ছিলেন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। সামরিক শাসন জারি থাকায় রাষ্ট্রক্ষমতা তখন মূলত জিয়ার হাতেই ছিল। জিয়া ১৯৭৭

সালের এপ্রিল মাসে সায়েমকে অকস্মাৎ ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন এবং ১৯৮১ সালের মে মাসে সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন (জিয়া সায়েমকে কীভাবে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন, তা জানার জন্য সায়েমের আত্মজৈবনিক বই 'বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি' পড়া যেতে পারে)। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ক্ষমতার সাড়ে পাঁচ বছরে জিয়া মোশতাকের অসমাপ্ত কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। বাংলাদেশকে শতভাগ পাকিস্তানি ভাবধারায় পরিচালনার গুরুদায়িত্ব জিয়ার হাতেই সম্পন্ন হয় বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসনের যে ধারা মোশতাক শুরু করেছিলেন, জিয়া তা অব্যাহত রাখেন এবং সেই প্রক্রিয়া জারি রাখেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া। শেখ হাসিনাও অন্তত দু-জন স্বাধীনতাবিরোধীকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়েছেন।

১.

মুজিবহত্যার পর খন্দকার মোশতাক বিশ্ব-ইতিহাসে নজিরবিহীন এক কাজ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি কুখ্যাত 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' জারি করেন। সেই অধ্যাদেশে লেখা ছিল– '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সাধিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তনের এবং সামরিক আইন ঘোষণার জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বা এরূপ পরিবর্তন বা ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিশেবে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কাজকর্ম, বিষয় বা ঘটনার জন্য বা কারণে বা প্রসঙ্গে এরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট ও কোর্ট মার্শাল কোনো আদালতের বা কর্তৃপক্ষের সমীপে বা নিকটে বা দ্বারা কোনো মামলা, অভিশংসন বা অন্য আইনগত বা শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হবে না বা গৃহীত হবে না।' অর্থাৎ পনেরোই আগস্ট ভোরে শেখ মুজিবুর রহমানকে যে হত্যা করা হয়েছে, এর কোনো বিচার-আচার করা যাবে না। 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' জারি করে মোশতাক শেখ মুজিবের খুনিদেরকে দায়মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দেশে যখন সংসদ থাকে না, রাষ্ট্রপতি তখন অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন; তবে, অধ্যাদেশ মানেই আইন না। পরবর্তী সংসদ অনুমোদন দিলে ঐ অধ্যাদেশ তবেই আইনে পরিণত হবে, অনুমোদন না দিলে অধ্যাদেশ বাতিল হয়ে যাবে। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সংসদ সেই 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ'কে সাংবিধানিক

স্বীকৃতি দিয়ে আইনে পরিণত করে এবং মুজিবহত্যাকাণ্ডের বিচার স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচারবন্ধে প্রণীত অধ্যাদেশ জিয়াউর রহমান কর্তৃক আইনে রূপান্তরের এই ঘটনায়ই প্রতীয়মান হয়– ভাবাদর্শে জিয়া ছিলেন মোশতাকেরই উত্তরসূরি, ক্ষেত্রবিশেষে মোশতাকের চেয়েও কয়েক কাঠি বেশি সরেস। 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' জারি মোশতাকের এবং তা অনুমোদন ছিল জিয়ার উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতাবিরোধী কাজ।

উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমান হত্যামামলা দায়ের হয় আওয়ামি লিগের দ্বিতীয় শাসনামলে– ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে, 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' বাতিল হয় ঐ বছরের নভেম্বরে। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে চার্জশিট দাখিলের পর বিচার শুরু হয় মার্চে; ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে পনেরো আসামির ফাঁসির আদেশ হয়, ২০০০ সালের জুনে ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শুরু হয় এবং সুপ্রিম কোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে বারো আসামির ফাঁসি বহাল থাকে ২০০১ সালের এপ্রিলে। কিন্তু জুলাইয়ে আওয়ামি লিগের শাসনকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অক্টোবরে যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে, তৎপরবর্তী পাঁচ বছর মুজিবহত্যামামলা হিমাগারে চলে যায়। সুপ্রিম কোর্টের এগারোজন বিচারপতি এই মামলার বিচারকার্যে 'বিব্রতবোধ' করেন। অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার মুজিবহত্যার বিচার স্তব্ধ করে রেখেছিল। খালেদা জিয়াও মুজিবের হত্যাকারীদেরকে অঘোষিত দায়মুক্তি দিয়েছিলেন।

২.

'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ'কে আইনে পরিণত করার জন্য সংসদে যিনি বিল উত্থাপন করেছিলেন, তার নাম শাহ্ আজিজুর রহমান। আজিজ মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানের কূটনীতিক দলের নেতৃত্ব দেন, বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার কথা অস্বীকার করেন, বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিশেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের আগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে শেখ মুজিব যে দাবি তুলেছিলেন, আজিজ এরও বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৪ মে আজিজ বিবৃতি

দেন– ‘প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদানপূর্বক দেশে পূর্ণ এবং বাধাহীনভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল অধুনালুপ্ত আওয়ামি লিগ এই সুযোগের ভুল অর্থ করে বলপ্রয়োগ আর শিরশ্ছেদের মাধ্যমে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিশাবে জয়লাভ করে অজেয়ভাবে নিজেদের খেয়ালখুশিতে দেশ শাসন করার দাবি করে এবং এভাবেই অহমিকা, অধৈর্য এবং ঔদ্ধত্যের ফলে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আমি জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।’ (তথ্যসূত্র : একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, পৃষ্ঠা ৯১)

১৯৭২ সালের দালাল আইনে আজিজ গ্রেপ্তার হন এবং শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পর ১৯৭৩ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার জন্য আজিজকে জাতীয় সংসদ ভবনের ভেতরেই একাধিকবার শারীরিকভাবে নাজেহাল করেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে এ রকম একজন চিহ্নিত দালাল ও ঘোরতর স্বাধীনতাবিরোধীকে প্রধানমন্ত্রী হিশেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। শাহ্ আজিজুর রহমানের আগে জিয়াউর রহমান আরেকজনকে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা দিয়ে ‘সিনিয়র মিনিস্টার’ বানিয়েছিলেন (১৯৭৮ সালের জুন থেকে ১৯৭৯ সালের মার্চ পর্যন্ত)। তার নাম মশিউর রহমান জাদু মিয়া। যথারীতি, জাদু মিয়াও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। এই অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে তিনি তিন বছর দুই মাস জেলও খেটেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাত-আট বছরের মাথায়ই জিয়াউর রহমানের কল্যাণে বাংলাদেশ দুই-দুইজন স্বাধীনতাবিরোধীকে প্রধানমন্ত্রী-পদে দেখতে পায়, যা তখনও ক্ষতস্থান না-শুকোনো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল নিঃসন্দেহে নরকযন্ত্রণা। উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায়ও স্বাধীনতাবিরোধীদের জয়জয়কার ছিল।

(কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ কবিতা লিখেছিলেন ১৯৭৭ সালের ৩ ডিসেম্বর, একুশ বছর বয়সে। কবিতাটার একটা বাক্য– ‘জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন।’ রুদ্র বেঁচে

থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত 'পুরোনো শকুন' কে বা কারা এবং কোনো যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রীর গাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়তে দেখে তিনি এই কবিতাটা লিখেছিলেন কি না। ১৯৯১ সালে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রুদ্র সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে চলে যান।)

এখানে আরো উল্লেখ্য– কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ সালে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' নামে একটা মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়। বিএনপি সরকার ২০০১ সালে ঐ মিলনায়তনের নাম রাখে 'শাহ আজিজুর রহমান মিলনায়তন'। আওয়ামি লিগের আমলে ২০১৩ সালে এর নাম পালটে রাখা হয়েছে 'বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তন'।

৩.

১৯৭২ সালের দালাল আদেশে দণ্ডিত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের ভোটার হতে পারবেন না (অর্থাৎ নির্বাচনেও প্রার্থী হতে পারবেন না)– এ রকম বিধানসংবলিত একটা অনুচ্ছেদ (১২২-এর ঙ) বাহাত্তরের সংবিধানে সংযুক্ত ছিল। এর মানে হলো– মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দালালি করে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি আদালত কর্তৃক দোষী প্রমাণিত হলে তিনি বাংলাদেশের ভোটারও হতে পারবেন না; নির্বাচনও করতে পারবেন না। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে এই অনুচ্ছেদটাও তুলে নিয়েছিলেন। এর ফলে, দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীরা পুনরায় ভোটার হওয়ার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদেরকে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার এবং তাদেরকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে দিয়েছেন জিয়া। 'দালাল আদেশ' বা 'কলাবরেটর্স অর্ডার' পাশ করেছিলেন শেখ মুজিব। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালে তিনি এই আইন পাশ করেন। এই আইনে সাঁইত্রিশ হাজারের বেশি অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী কারাগারে ছিলেন। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ– সুনির্দিষ্টভাবে এই চার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত না থাকা আসামিদের জন্য শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও এগারো হাজারের বেশি অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী কারাগারে ছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সামরিক আদেশ-বলে জিয়াউর রহমান 'দালাল আদেশ' বাতিল করে দেন, এই আইনের অধীন বন্দিদেরকে কারামুক্ত করে

দেন, এমনকি এই আইনে দণ্ডিতদেরকেও (৭৫২ জন) তিনি মুক্ত করে দেন। বাহাত্তরের সংবিধানের প্রথম তফসিলে বর্ণিত ছিল– অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও, অন্য কোনো আইনের সাথে যদি কোনোভাবে সাংঘর্ষিকও হয়, তা হলেও ১৯৭২ সালের 'দালাল আদেশ' কার্যকর থাকবে। জিয়া সংবিধানের প্রথম তফসিল থেকে এই বিধানও তুলে নেন।

৪.

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যেসব রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের জন্মের সক্রিয় ও সশস্ত্র বিরোধিতা করেছিল; মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেসব দল রাজনীতিতে ফিরে আসার দুঃসাহস দেখায়নি, দলগুলোর সাধারণ নেতাকর্মীরা দেশেই গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন, শীর্ষ নেতারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা না-চাওয়া বিভিন্ন দেশে পালিয়ে ছিলেন। ফলে, ঐ দলগুলোকে সদ্য স্বাধীন দেশে আলাদাভাবে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন পড়েনি। শেখ মুজিবুর রহমান, তবুও, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন। বাহাত্তরের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮-এ উল্লিখিত ছিল– 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোনো প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।' মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দলগুলোর অধিকাংশই যেহেতু ধর্মভিত্তিক ছিল এবং যেহেতু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর তাদের এ দেশীয় দোসররা ধর্মের দোহাই দিয়েই গণহত্যা চালিয়েছিল, সেহেতু মুজিব ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ধর্মভিত্তিক একটি সংগঠনও মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতাকারী শীর্ষ সংগঠন ছিল জামায়াতে ইসলামি; এই তালিকায় এ ছাড়া ছিল নেজামে ইসলাম, ওলামায়ে ইসলাম, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, মুসলিম লিগও। মুসলিম লিগের ছিল তিন গ্রুপ। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর যে প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ছিল, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাও প্রত্যাহার করে নেন। ফলে, স্বাধীন দেশে জামায়াতে ইসলামি-সহ স্বাধীনতাবিরোধী অন্যান্য দলের রাজনীতিতে

আর কোনো বাধা রইল না। জিয়াউর রহমান শুধু দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীদের ভোটাধিকারই ফিরিয়ে দেননি, তাদেরকে রাজনীতি করার এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সমস্ত সুযোগও তৈরি করে দিয়েছিলেন।

৫.

'দালাল আদেশ' পাশ হয়েছিল ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি। ১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেসব আসামি ট্রাইবুনালে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে বাংলাদেশ সরকার। তখন ঊনচল্লিশজনের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছিল, এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন একাত্তরের গণহত্যার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড জামায়াত-নেতা গোলাম আজম। আজম ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে পাকিস্তানের নাগরিক হিশেবে তিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চালিয়েছেন (যাতে কোনো দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিশেবে স্বীকৃতি না দেয়) এবং পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের কনফেডারেশন তৈরির চেষ্টা করেছেন। মুজিব জীবিত থাকাকালে আজম, খুব স্বাভাবিকভাবেই, বাংলাদেশে ফিরে আসার বা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা কল্পনাও করেননি। যারা নাগরিকত্ব চায়, ১৯৭৬ সালের ২০ মে জিয়াউর রহমান তাদের জন্য একটা প্রেস নোট জারি করেন এবং সেই সুযোগ নিয়ে আজম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য একাধিকবার প্রচেষ্টা চালান। মায়ের মৃত্যুকে পুঁজি করে আজম ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। সে বছর জিয়াউর রহমান তাকে দুইবার ভিসা নবায়ন করার সুযোগ দেন। ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে আজম বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাকিস্তানি পাসপোর্ট জমা দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে জিয়ার জীবদ্দশায় আজম নাগরিকত্ব পাননি। কিন্তু ইতিহাসে লেখা থাকবে– যুদ্ধাপরাধের দায়ে পরবর্তীকালে নব্বই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী গোলাম আজম জিয়াউর রহমানের আমলেই দেশে ফেরার সুযোগ পেয়েছিলেন, জিয়ার অবশিষ্ট জীবনকালের পুরোটাজুড়েই আজম অবৈধভাবে বাংলাদেশে ছিলেন।

৬.

বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল দ্বাদশ অনুচ্ছেদ। তাতে লেখা ছিল– 'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার, কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।' মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসররা গণহত্যার অজুহাত হিশেবে ধর্মকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কারণে নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অনিবার্য ছিল। পাকিস্তান নামক ধর্মরাষ্ট্রের পিঞ্জর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা রাষ্ট্রও কোনোক্রমেই আরেকটা ধর্মরাষ্ট্র হতে পারে না, সেই রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থাকতে পারে না, সেই রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রধর্মও থাকতে পারে না। ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্বাসনে পাঠান (এবং এরই সূত্র ধরে আরেক সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনী এনে সংবিধানে অতর্কিতে রাষ্ট্রধর্ম সংযুক্ত করেন)। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা উঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পুনরায় চালু করার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলই মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় বিরোধিতা করেছিল। ফলে, স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চালু করে দেওয়ার অর্থই হলো কিছু স্বাধীনতাবিরোধী দলকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা উঠিয়ে নিয়ে জিয়াউর রহমান মূলত স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকেই রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৭.

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়াউর রহমান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কি না, তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে, 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' অনুমোদনের পাশাপাশি মুজিবের স্বঘোষিত খুনিদেরকে জিয়া বিভিন্নভাবে পুরস্কৃতও করেছিলেন। শেখ মুজিবকে সপরিবারে যারা হত্যা করেছিলেন, সেই খুনিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন জিয়াউর রহমান। যেহেতু মোশতাক, সায়েম ও জিয়ার সরকার ছিল সরাসরি

মুজিবহত্যার ফসল; সেহেতু এই তিন সরকারে মুজিবের খুনিরা, খুব স্বাভাবিকভাবেই, নিজেদের প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। মোশতাক ও সায়েম সেই প্রভাব-প্রভুত্ব হজম করলেও জিয়া হজম করেননি। বরং বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে শান্ত রেখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের মধ্যে শরিফুল হক ডালিমকে চায়না দূতাবাসের প্রথম সচিব, আজিজ পাশাকে আর্জেন্টিনার প্রথম সচিব, একেএম মহিউদ্দিন আহমেদকে আলজেরিয়ার প্রথম সচিব, বজলুল হুদাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সচিব, শাহরিয়ার রশিদকে ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় সচিব, রাশেদ চৌধুরীকে সৌদি আরবের দ্বিতীয় সচিব, নূর চৌধুরীকে ইরানের দ্বিতীয় সচিব, শরিফুল হোসেনকে কুয়েত দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে চাকরি দেওয়া হয় জিয়াউর রহমানের আমলে। স্বাধীনতার স্থপতির খুনিদের বিচারের ব্যবস্থা না করে উলটো পুরস্কারস্বরূপ চাকরি দিয়ে বিদেশে আয়েশী জীবন যাপনের সুযোগ করে দেওয়া নিশ্চয়ই স্বাধীনতার স্বপক্ষের কারো কাজ হতে পারে না।

৮.

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো– ১৯৮০ সাল পর্যন্ত টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে সার্বক্ষণিক কড়া পাহারা বসানো থাকত, যাতে কেউ ঐ সমাধিতে ঘেঁষতে না পারে। কেউ সমাধির কাছাকাছি গেলে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। মুজিবের কবর জিয়ারত করার অপরাধে হাজি গোলাম মোরশেদ নামক একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারের বাড়িটাও তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। এইসব তথ্য পাওয়া যায় অধ্যাপক আবু সাইয়িদের ‘মুক্তিযুদ্ধের দলিল লণ্ডভণ্ড এবং অতঃপর’ বইয়ের ৮০ পৃষ্ঠায়। জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় বেতারে-টেলিভিশনে শেখ মুজিব অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধই ছিলেন। তখন সরকারি গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ততটুকু ইতিহাসই প্রচার করা হতো, যতটুকুর সাথে জিয়াউর রহমানকে সংশ্লিষ্ট করা যায়।

৯.

এ কথা সর্বজনবিদিত– রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরোক্ষ দিকনির্দেশনাসংবলিত ভাষণ দেওয়ায় ৭ মার্চ তারিখটা গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেই

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। জিয়া ১৯৭৬ সালের ৭ মার্চ, সেই রেসকোর্স ময়দানে বিমানবাহিনীপ্রধান গোলাম তাওয়াবকে দিয়ে 'সিরাত মাহফিল' আয়োজন করান। তাতে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা, যাদের অধিকাংশই বাহাত্তরের দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত। বক্তব্য রাখেন তরুণ মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীও। যে রেসকোর্স ময়দানে যে তারিখে স্বাধীনতার স্থপতি স্বাধীনতা-আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করেছেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধের মাত্রই সোয়া চার বছরের মাথায় সেই রেসকোর্স ময়দানে ঠিক সেই তারিখেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক মাহফিল আয়োজন করেছে– এই দৃশ্য দেখার পর শহিদপরিবারগুলোর অনুভূতি কী হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে একযোগে মাঠে নামালে মুক্তিযোদ্ধারা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখান, তা পরখ করে দেখাই ছিল ঐ মাহফিল আয়োজনের উদ্দেশ্য। আলোচ্য মাহফিল থেকে দাবি ওঠে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের, এমনকি বাংলাদেশকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' ঘোষণারও; এই মাহফিল থেকে স্লোগান উঠেছিল– 'তাওয়াব ভাই, তাওয়াব ভাই, চান-তারা পতাকা চাই।' স্বাধীনতাবিরোধী চক্র জিয়াউর রহমানের আমলেই এত দুঃসাহস পেয়েছিল। অর্থাৎ জিয়ার আমল ছিল যুদ্ধাপরাধীদের জন্য সবচেয়ে নিশ্চিত সময় তথা মধুচন্দ্রিমা-কাল।

১০.

ঢাকার শাহবাগে যে শিশুপার্কটি আছে; সেটি প্রতিষ্ঠা করেন জিয়াউর রহমান, ১৯৭৯ সালে। সেই সুবাদে পার্কটি বিএনপির আমলগুলোয় 'শহিদ জিয়া শিশুপার্ক' নামেও পরিচিত ছিল। কিন্তু এই পার্ক অরাজনৈতিক না। এই পার্কের পেছনেও সুগভীর রাজনীতি আছে। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই জায়গা যাতে ভবিষ্যতে কখনও চিহ্নিত করা না যায় এবং 'রেসকোর্স ময়দান' বা 'সোহরাওয়ার্দি উদ্যান' নামোচ্চারণের সাথে-সাথে মানসপটে ৭ মার্চের ভাষণ ভেসে না উঠে অন্যকিছু ভাসে; সেজন্য জিয়াউর রহমান ঠিক ঐ জায়গায় বা এর কাছাকাছি স্থানে শিশুপার্ক নির্মাণ করেন। ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ এই উদ্যানেই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে

সংবর্ধনা দিয়েছিলেন শেখ মুজিব এবং স্থাপন করেছিলেন 'ইন্দিরা মঞ্চ'। শিশুপার্ক নির্মাণের আড়ালে সেই 'ইন্দিরা মঞ্চ'ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক যুগান্তরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আবদুল মান্নানের লেখা একটা কলাম থেকে জানা যায়– 'প্রয়াত সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, যিনি বিএনপিঘেঁষা একজন সাংবাদিক ছিলেন, তিনি প্রেস ক্লাবের এক সেমিনারে বলেছিলেন– জিয়া চাননি কোনো মুসলমান জেনারেল অমুসলমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এর কোনো স্মারক বাংলাদেশে থাকুক।' শাহবাগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিশুপার্ক-নির্মাণের মাধ্যমে, বাংলাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান জিয়া ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; রেসকোর্স ময়দানকে তিনি পাদপ্রদীপের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। জিয়ার কর্মকাণ্ড সাক্ষ্য দেয়– মুজিব-সংক্রান্ত যেকোনো কিছুতে তার আকণ্ঠ আক্রোশ ছিল, তার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ছিল মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন স্মারকও নিশ্চিহ্ন করার।

নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা– এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি এ রকম– 'এই শিশুপার্ক সেদিন ছিল না, এই বৃক্ষে-ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না, এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না। তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি? তা হলে কেমন ছিল শিশুপার্কে বেঞ্চে-বৃক্ষে ফুলের বাগানে ঢেকে দেওয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি? জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত কালো হাত। তাই দেখি– কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ কবির বিরুদ্ধে কবি, মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ, বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল, উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান, মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ' (রচনাকাল ১৯৮০)। ৭ মার্চের সব স্মৃতি মুছে দিতে কালো হাত উদ্যত হয়েছিল বলে গুণ এখানে যে অভিযোগ করেছেন, সেই কালো হাত কার; তা নিশ্চয়ই বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এই নিবন্ধ লেখার মাঝপথে কবি নির্মলেন্দু গুণের সাথে কথা বলে জেনেছি– 'উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান' বলতে তিনি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের (রেসকোর্স ময়দান) বিরুদ্ধে দাঁড় করানো শিশুপার্ককে বুঝিয়েছেন। শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় রাজনৈতিক সমাবেশগুলো রেসকোর্স ময়দানেই হতো। তার মৃত্যুর পর 'বহুদলীয় গণতন্ত্র' চালু হলেও সামরিক শাসন জারি থাকার কারণে রাজনৈতিক সমাবেশের অনুমতি ছিল না। পরবর্তীকালে জিয়া 'ঘরোয়া

রাজনীতি'র অনুমতি দেন এবং গুলিস্তানে জিপিওর পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় (মুক্তাঙ্গন) ক্ষুদ্র পরিসরে সভা করার সুযোগ দেন। এই প্রক্রিয়াকেই গুণ 'মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ' বলেছেন। পনেরোই আগস্টের পর শাসকগোষ্ঠীকে তোয়াজ করার জন্য অখ্যাত অনেক কবি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিলেন এবং প্রগতিশীল কিছু কবি নিপীড়িত হওয়ার ভয়ে পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি। 'কবির বিরুদ্ধে কবি'– এখানে প্রথমোক্ত 'কবি' স্বয়ং মুজিব (৭ মার্চের ভাষণ কবিতার মতো ছিল বিধায়) আর দ্বিতীয়োক্ত 'কবি' হলেন ঐ দুই শ্রেণির কবিসম্প্রদায়। আর 'মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ' বলতে গুণ শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের বিপরীতে স্বাধীনতাবিরোধীদের ১৯৭৬ সালের ৭ মার্চের সভা আর সামরিক শাসকদের মার্চপাস্টকে (কুচকাওয়াজ) বুঝিয়েছেন।

১১.

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়– একাত্তরের গণহত্যা নিয়ে আলোচনা উঠলে বিএনপি 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী'র নাম উচ্চারণ করে না। গণহত্যাকারী সংগঠনের নাম বলা অনিবার্য হয়ে উঠলে বিএনপি একটা শব্দ ব্যবহার করে– 'হানাদারবাহিনী'। কোন দেশের কোন বাহিনী– বিএনপি পারতপক্ষে তা মুখে আনে না; ব্যাপারটা তারা 'হানাদারবাহিনী' দিয়েই চালিয়ে দেয়। একই উদ্দেশ্যে এই একই শব্দ জাতীয় পার্টিও ব্যবহার করে থাকে, ব্যবহার করে জামায়াতে ইসলামিও। ২০১৫ সালে শহিদ বুদ্ধিজীবীদিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে বিএনপির খালেদা জিয়া এবং জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ দুজনই বলেছেন ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা হানাদারবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন আর জামায়াতে ইসলামি বাণী দিয়েছে আরো ভাববাচ্যে– ১৪ ডিসেম্বর শাহাদাতবরণকারী বুদ্ধিজীবীদেরকে জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। বুদ্ধিজীবীরা কাদের দ্বারা শহিদ হয়েছেন, এর কোনো হদিস জামায়াতের বাণীতে ছিল না। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীনিধনে নেতৃত্ব দিয়েছিল জামায়াতেরই তৎকালীন ছাত্রসংগঠন ছাত্রসংঘের কিলিং স্কয়াড আল-বদর।

যা হোক, এই 'হানাদারবাহিনী' শব্দের আবিষ্কারক ও প্রবক্তা জিয়াউর রহমান। জিয়ার আমলে কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র ও পাঠ্যপুস্তকে 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী', 'রেজাকার', 'আল-বদর' বা 'আল-শামস'

শব্দগুলো ব্যবহৃত হতো না; ব্যবহৃত হতো 'হানাদারবাহিনী' (তথ্যসূত্র– 'এক্সপ্লেইন হোয়াট ইজ হানাদারবাহিনী', শাহরিয়ার খান, ডেইলি স্টার অনলাইন, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫)। জিয়ার আমলের পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষার্থীরা জানতে পারত না এ দেশে গণহত্যা কারা চালিয়েছিল, কারা তাদের দালালি করেছিল। 'হানাদারবাহিনী' শব্দটা এখন এতটাই অবলীলায় ব্যবহৃত হয় যে, ব্যবহারকারীরা জানেনই না এই শব্দের আড়ালে কী গভীর রাজনীতি লুকিয়ে আছে। জিয়া এমন একটা প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন– একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে যারা কিছুই জানবে না, জানবে না পাকিস্তানের এ দেশীয় দোসরদের সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত পরিচয়। পাকিস্তান কোনোভাবে বিরক্ত হয় বা বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীরা কোনোক্রমে বিব্রত হয়– ক্ষমতায় থাকাকালে এমন কোনো কাজ জিয়াউর রহমান করেননি।

এখানে আরো উল্লেখ্য– ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বিএনপির পক্ষ থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের একটা ভিডিওবার্তা প্রচার করা হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ফখরুল সেখানে বলেন– 'আমার বয়স যখন আপনাদের মতো, তখন আমরা একটা যুদ্ধে গিয়েছিলাম দেশটাকে মুক্ত করব বলে। তখন আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ ছিল, যারা বলত– পাঞ্জাবিদের সাথে যুদ্ধে আমরা কোনোদিনও পারব না, মেরে-কেটে ওরা শেষ করে দেবে।' অর্থাৎ ফখরুলও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে 'পাঞ্জাবি' বলেই চালিয়ে দিয়েছেন, তিনিও 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী' কথাটা উচ্চারণ করেননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নাম উচ্চারণ করতে বিএনপি মহাসচিবের সমস্যা কোথায়, তা স্পষ্ট না। কবে কোথায় কার অধীনে যুদ্ধ করেছেন, ফখরুল তাও স্পষ্ট করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য– ফখরুলের বাবা মির্জা রুহুল আমিন যুদ্ধাপরাধের দায়ে ১৯৭২ সালের দালাল আইনে গ্রেপ্তার হয়ে কারাভোগ করেন, এমনকি 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষিত হওয়ার পরও রুহুল আমিন মুক্ত হননি। সাধারণ ক্ষমা ছিল কেবল তাদের জন্য– মুক্তিযুদ্ধে যারা হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত ছিলেন না। রুহুল আমিন 'সাধারণ ক্ষমা' পাননি, তিনি কারামুক্ত হন জিয়াউর রহমানের আমলে দালাল আদেশ বাতিল হওয়ার পরে।

১২.

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ রঙ দেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতীক। আর লাল বৃত্ত নির্দেশ করে স্বাধীনতার লাল সূর্য, তথা মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের রক্ত। অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো– ১৯৭৮ সালের বিজয়দিবসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নির্দেশ দেন ঢাকার কিছু সরকারি ভবনে সবুজের মাঝে লাল বৃত্তের পরিবর্তে কমলা বৃত্তের পতাকা ওড়ানোর জন্য। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের 'জেনারেল জিয়ার রাজত্ব' বইয়ে এই তথ্য পাওয়া যায়। পতাকার রঙে সামান্য পরিবর্তন এনে জিয়া পরীক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন পতাকা পুরোপুরি পালটে ফেললে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে। কিন্তু জাতীয় পতাকার এমন অবমাননার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায় জিয়া এই দুরভিসন্ধিমূলক উদ্যোগ থেকে সরে গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের রক্তের লাল প্রতীককে জাতীয় পতাকা থেকে সরিয়ে দিতেও জিয়া দ্বিধাবোধ করেননি। উল্লেখ্য– এই ঘটনার চারদিন আগে, ১৯৭৮ সালের ১২ ডিসেম্বর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেট অধিবেশনে কোরান তেলাওয়াতের আগে জাতীয় সংগীত গাওয়ায় জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম জেলা বিএনপির নেতা ডা. ইউসুফ বলেন– 'স্যার, আমাদের পতাকায় ইসলামি রং নেই, এটা আমাদের ভালো লাগে না। এটা ইসলামি তাহজ্জিব ও তমুদ্দুনের সাথে মিলছে না।' উত্তরে জিয়া বলেছিলেন– 'হবে, হবে। সবকিছুই হবে। আগে হিন্দুর লেখা জাতীয় সংগীত বদলানো হোক। তারপর জাতীয় পতাকার কথা ভাবব।' সাংবাদিক আবেদ খানের 'ষড়যন্ত্রের জালে বিপন্ন রাজনীতি' বইয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

১৩.

জিয়াউর রহমান জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন এর পরের বছর। ১৯৭৯ সালের ৩০ এপ্রিল জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রস্তাব আসে। ঐ সময়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এক গোপন চিঠিতে মন্ত্রিপরিষদকে লেখেন– 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি গান ভারতীয় জাতীয় সংগীত। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন। আমার সোনার বাংলা গানটি আমাদের সংস্কৃতির চেতনার পরিপন্থি বিধায় জাতীয় সংগীত পরিবর্তন আবশ্যক।' ঐ

চিঠিতে ‘আমার সোনার বাংলা’র পরিবর্তে ‘প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ'কে জাতীয় সংগীত করার প্রস্তাব করেন আজিজ (গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির, সুরকার আলাউদ্দিন আলী)। প্রধানমন্ত্রীর ঐ চিঠি পেয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রেডিও, টেলিভিশন এবং সব সরকারি অনুষ্ঠানে প্রথম বাংলাদেশ গানটি প্রচারের নির্দেশনাও জারি করে। এ সময়ে রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি ‘প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ’ গাওয়া শুরু হয়। কিন্তু জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের পরিকল্পনা ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেমে যায়।

জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের তোড়জোড় খালেদা জিয়ার আমলেও দেখা গিয়েছিল। ২০০২ সালের ১৯ মার্চ তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামির আমির মতিউর রহমান নিজামী এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি যৌথ সুপারিশপত্র প্রধামন্ত্রীর কাছে জমা দেন। তাতে বলা হয়– সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের ইসলামি মূল্যবোধ ও চেতনার আলোকে জাতীয় সংগীত সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া চিঠিটা প্রত্যাখ্যান না করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে পাঠান। সংস্কৃতিমন্ত্রী খুরশিদ জাহান হক (খালেদা জিয়ার বড়বোন) বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে সচিবের কাছে প্রেরণ করেন। জাতীয় সংগীত পরিবর্তনকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারবহির্ভূত বিষয় অভিহিত করে সচিব তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠান। একই বছরের ১৯ আগস্ট প্রস্তাবটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই সরকারের আমলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। এর পর এ সম্পর্কে আর কোনো তৎপরতা নথিতে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের অপচেষ্টা জিয়াউর রহমানের আমলেও হয়েছে, খালেদা জিয়ার আমলেও হয়েছে।

জিয়া-দম্পতির বাইরে আরো একজন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন– খন্দকার মোশতাক আহমেদ। ১৯৭৫ সালের আগস্টে ক্ষমতায় বসেই মোশতাক জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী দীন মুহম্মদকে ঐ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। কমিটিকে বলা হয় এক মাসের মধ্যে নতুন কোনো গানকে ‘জাতীয়

সংগীত' হিশেবে প্রস্তাব করতে। সে কমিটি দুটো গানের একটিকে জাতীয় সংগীত করার প্রস্তাব করে প্রতিবেদন জমা দেয়– কাজী নজরুল ইসলামের 'চল চল চল' এবং ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' কবিতা। কিন্তু অভ্যুত্থান পালটা-অভ্যুত্থানে ঐ প্রস্তাব আর হালে পানি পায়নি। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধকালে কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তান-অনুগত দালাল শিক্ষকদের নেতা। দালাল শিক্ষকদের একটা দল নিয়ে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সাথে দীন মুহম্মদ দেখাও করেছিলেন।

১৪.

বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবিধান অনুমোদিত হয় প্রথম বিজয়দিবসে, ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সেই সংবিধানের শুরুতেই, অর্থাৎ প্রস্তাবনায়, বলা হয়– 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।' কিন্তু ১৯৭৯ সালে সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী আনেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান শব্দগত যে পরিবর্তনটি সংবিধানে এনেছিলেন, তা হলো– উল্লিখিত প্রস্তাবনায় তিনি 'মুক্তি'র পরিবর্তে 'স্বাধীনতা' এবং 'সংগ্রাম'-এর পরিবর্তে 'যুদ্ধ' শব্দটা প্রতিস্থাপন করেছেন। তাতে পুরো বাক্যটা দাঁড়িয়েছিল– 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।' জিয়াউর রহমানের পরিবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায়– একাত্তরের যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতার জন্য, অথচ বাংলাদেশ (যুদ্ধের আগেই) ২৬ মার্চ থেকেই স্বাধীন। জিয়াউর রহমানের এই সংবিধান-মতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ড আসলে পূর্ব পাকিস্তানই ছিল, বাংলাদেশ ছিল না। এখানে শব্দের আরো দ্যোতনা ও যাতনা আছে। 'ঐতিহাসিক যুদ্ধ' বললে কেবল ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের সশস্ত্র যুদ্ধকে বোঝায়। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামটা শুধু ঐ নয়মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল না; তেইশ বছরের (১৯৪৭ থেকে ১৯৭১) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামও ছিল। সংবিধানে 'ঐতিহাসিক সংগ্রাম' না বলে 'ঐতিহাসিক যুদ্ধ' বললে ঐ তেইশ

বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামটাকে বেঘোরে অস্বীকার করা হয়। অস্বীকার করা হয় ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন, ১৯৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, বাংলাকে ১৯৫৬-এর সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে অন্তর্ভুক্তকরণের আন্দোলন, ১৯৬২-এর শিক্ষা-আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন কিংবা ১৯৭১-এর ৭ মার্চকে। সংবিধানে 'ঐতিহাসিক যুদ্ধ' কথাটা থাকার পরোক্ষ অর্থ দাঁড়ায়– নয়মাসের সামরিক যুদ্ধটা ভিনগ্রহ থেকে আচমকা আমদানি হয়েছে, এর আগের দুই যুগে আর কিছুই ঘটেনি, ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণার মাধ্যমে 'ঐতিহাসিক যুদ্ধ' শুরু হয়ে ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির সদলবল আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে 'ঐতিহাসিক যুদ্ধ' শেষ হয়ে গেছে।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ'-কে 'স্বাধীনতাযুদ্ধ' বানিয়েই ক্ষান্ত হননি। ১৯৮১ সালে তিনি অত্যন্ত অভাবনীয় একটা ঘোষণা দেন। তা হলো ২৬ মার্চ 'স্বাধীনতাদিবস' হিশেবে পালিত না হয়ে 'জাতীয় দিবস' নামে পালিত হবে এবং ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয়দিবস' হিশেবে পালিত না হয়ে পালিত হবে 'স্বাধীনতাদিবস' হিশেবে। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো– এই ভূখণ্ডের লোকজন ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিক ছিল, ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দেশ পাকিস্তানই ছিল। এর ফলে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা, ১০ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারগঠন (মুজিবনগর সরকার) ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অস্থায়ী সংবিধান) প্রণয়ন, ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের শপথগ্রহণ অবৈধ হয়ে যায়; একাত্তরের যুদ্ধটা মুক্তিযুদ্ধ না হয়ে পরিণত হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে। ১৯৭২ সালে যে 'দালাল আদেশ' পাশ করা হয়েছিল; সেই আইন অনুযায়ী বিচার করা সম্ভব ছিল শুধু দেশীয় দালালদের, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের না। বাংলাদেশের 'স্বাধীনতাদিবস' যদি ১৬ ডিসেম্বর হয়, তা হলে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের সবাইকে পাকিস্তানের নাগরিক বলে গণ্য করতে হয়। সে হিশেবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ দালালরাও ছিল পাকিস্তানের নাগরিক। এর মানে দাঁড়ায়– ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য বাংলাদেশ কোনো আইনই তৈরি করতে পারবে না (যেহেতু বাংলাদেশের আইন দিয়ে পাকিস্তানিদের বিচার করা যায় না)। ভবিষ্যতেও যেন কেউ এ দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আইন তৈরি না পারে, জিয়াউর রহমান

সেজন্য ‘স্বাধীনতাদিবস’ ২৬ মার্চের বদলে ‘১৬ ডিসেম্বর’ পালন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৮১ সালের মে মাসেই নিহত হওয়ায় জিয়া ১৬ ডিসেম্বর একবারও স্বাধীনতাদিবস পালন করে যেতে পারেননি। ঐ বছরের ২৬ মার্চ ‘জাতীয় দিবস’ পালন করায় তিনি ব্যাপক প্রতিবাদের মুখোমুখি হন এবং ঘোষণা দেন– পরের বছর থেকে ২৬ মার্চ ‘জাতীয় দিবস’ হিশেবে পালিত না হয়ে ‘স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ হিশেবে পালিত হবে। এসব তথ্য নিয়েছি অধ্যাপক আবু সাইয়িদের ‘জেনারেল জিয়ার রাজত্ব’ ও সাংবাদিক আবেদ খানের ‘ষড়যন্ত্রের জালে বিপন্ন রাজনীতি’ বই থেকে। মোদ্দা কথা– জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের বুক থেকে মুক্তিযুদ্ধ নামক অধ্যায়টাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নাম-নিশানা থাকুক– এর কোনো সুযোগই তিনি রাখতে চাননি। সংবিধান, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, রেসকোর্স ময়দান– ইত্যাকার এমন কিছু নেই, যা ধুয়েমুছে তিনি মুক্তিযুদ্ধের গন্ধ তাড়ানোর চেষ্টা করতে বাকি রেখেছেন।

১৫.

জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সশস্ত্রবাহিনীতে বেশ কয়েকবার অভ্যুত্থান ঘটেছিল। অভ্যুত্থানের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় না; কেননা কোনটাকে অভ্যুত্থান বলে ধরা হবে, আর কোনটাকে অভ্যুত্থান ধরা হবে না– এর সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই। কোথাও তথ্য পাওয়া যায় জিয়ার আমলে অভ্যুত্থান ঘটেছে উনিশবার, কোথাও তেইশবার, কোথাও সাতাশবার; গড়পড়তা ধরে নেওয়া যায় পঁচিশবার। জিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর, বিমানবাহিনীতে। প্রতিটা অভ্যুত্থানের পর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহীদেরকে ফাঁসিতে ঝোলাতেন কিংবা ফায়ারিং স্কয়াডে পাঠাতেন। বলাই বাহুল্য যে, বিচারের স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক ন্যূনতম মানদণ্ডের ছিটেফোঁটাও জিয়া মেনে চলতেন না। মৃত্যুদণ্ডের আদেশে স্বাক্ষর করতে-করতে জিয়া ক্লান্ত হয়ে যেতেন। সেরেফ নাম মিলে যাওয়ার কারণে এক বন্দিকে ফাঁসি না দিয়ে আরেক বন্দিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে– জিয়ার আমলে এমন ঘটনা সাধারণ ছিল। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগেই সৈন্যদের হাত-পায়ের রগ কেটে দেওয়া হতো, রক্তে ভেসে যেত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পার্শ্ববর্তী নর্দমা। ধর্মীয় বিশ্বাস

অনুযায়ী লাশ সৎকারের সুযোগও দেওয়া হয়নি তখন। পরিবারগুলোও জানত না তাদের স্বজন বেঁচে আছেন, নাকি ফাঁসিতে ঝুলেছেন। অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সন্দেহে জিয়াউর রহমানের হুকুমে সশস্ত্র বাহিনীর মোট কয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এর সঠিক হিশাব এখন আর পাওয়া যায় না। অধিকাংশ নথি গায়েব করে ফেলা হয়েছে। তবে, এই সংখ্যাটা এক হাজার থেকে দুই হাজারের মাঝামাঝি ('জিয়াউর রহমানের আমলে সেনাহত্যা' লিখে গুগল করলেই এ সংক্রান্ত অসংখ্য লেখা পাওয়া যাবে)। জিয়ার আমলে নিখোঁজ হওয়া কিছু সেনাসদস্য এখনও নিখোঁজ। উল্লেখ্য জিয়াউর রহমানের হুকুমে ফাঁসিতে ঝোলানো বা ফায়ারিং স্কয়াডে পাঠানো সেনাসদস্যদের একটা বড় অংশই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

১৬.

জিয়াউর রহমানের দুটো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল 'একুশে পদক' ও 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রবর্তন। তিনি ১৯৭৬ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৭৭ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। জিয়ার আমলে দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গকেই পুরস্কার দুটো দেওয়া হচ্ছিল। ফলে, 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এতটাই সম্মানজনক হয়ে উঠেছিল যে, একে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক হিশেবে গণ্য করা হতে থাকে। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে এসে জিয়াউর রহমান 'স্বাধীনতা পুরস্কার'কে একটা বিচিত্র উপায়ে কলুষিত করেন। ১৯৮০ সালে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' দেন পিরোজপুরের ছারছিনা দরবার শরিফের পির আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহকে। আবু জাফর বৃহত্তর বরিশালের মুখ্য স্বাধীনতাবিরোধীদের একজন। অর্ধসহস্রাধিক রেজাকার, দালাল ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর তিনি মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী তাকে গৃহবন্দি করে রাখে। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি তাকে গ্রেপ্তার করে বরিশালে নিয়ে যাওয়া হয়। আবু জাফর দালাল আইনে জেল খাটতে থাকেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। আবু জাফরের যুদ্ধাপরাধের বর্ণনা পাওয়া যায় 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' বইয়ে (পৃষ্ঠা ৯১-৯৪)। যে পুরস্কারের নামের সাথে 'স্বাধীনতা' শব্দটা জড়িয়ে আছে, দালাল আইনে

জেল খাটা একজন স্বাধীনতাবিরোধীর হাতেও সেই ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ তুলে দিতে জিয়া দ্বিধাবোধ করেননি।

একই সালে (১৯৮০) সাহিত্যে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ দেওয়া হয় কবি ফররুখ আহমদ ও নাট্যকার মুনীর চৌধুরীকে। ফররুখ চল্লিশের দশকের অত্যন্ত শক্তিমান কবি, তার কাব্যপ্রতিভা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন, জামায়াতে ইসলামির মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম’-এ ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসরদেরকে উৎসাহ দিয়ে কবিতা লিখেছেন, যুদ্ধের পর বাংলা অ্যাকাডেমিতে তার প্রবেশ অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সদ্য স্বাধীন দেশে, ১৯৭৪ সালে, মৃত্যুর পর তার মরদেহ দাফন নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত শাহজাহানপুর কবরস্থানে কবি বেনজির আহমেদের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয় (বেনজিরও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন)। অপরপক্ষে মুনীর চৌধুরী একজন শহিদ বুদ্ধিজীবী। জামায়াতে ইসলামির তৎকালীন ছাত্রসংগঠন ছাত্রসংঘের কিলিং স্কয়াড আল-বদর বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর যেসব বুদ্ধিজীবীদেরকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে, মুনীর চৌধুরী তাদের অন্যতম। জিয়াউর রহমান একজন শহিদ বুদ্ধিজীবীকে যে মঞ্চে পুরস্কৃত (মরণোত্তর) করেছেন, সেই একই মঞ্চে পুরস্কৃত করেছেন দুজন স্বাধীনতাবিরোধীকেও। সেদিন মুনীর চৌধুরীর পক্ষে কেউ পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন কি না, গিয়ে থাকলে তার অনুভূতি কী হয়েছিল– জানি না। এটুকু জানি– জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একটা অদ্ভুত ও জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন। একই রাষ্ট্রপতি একই মঞ্চে শহিদ বুদ্ধিজীবীকেও পুরস্কৃত করছেন, আবার দালাল আইনে জেল খাটা যুদ্ধাপরাধীকেও পুরস্কৃত করছেন– সম্ভবত বিশ্ব-ইতিহাসেই এ এক নজিরবিহীন নৃত্যনাট্য। উল্লেখ্য, ‘পল্লি উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্য’ ১৯৭৭ সালে মাহবুব আলম চাষীকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ দেন জিয়াউর রহমান। এই মাহবুব আলম চাষী শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত শীর্ষ ষড়যন্ত্রকারীদের একজন হিশেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

১৭.

জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতেও সেসব কর্মকর্তাকে উচ্চপদে আসীন করেছিলেন এবং দ্রুত পদোন্নতি দিয়েছিলেন; যারা মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়ে পাকিস্তানে ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধশেষে বাংলাদেশে ফিরেছেন। উদাহরণস্বরূপ– ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সেনাপ্রধান হিশেবে নিয়োগ দেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে-সাথে এরশাদ পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিলেন, বাংলাদেশে ফিরেছিলেন ১৯৭৩ সালে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে বিন্দুমাত্র ভূমিকা না-থাকা এরশাদকেই সেনাপ্রধান হিশেবে জিয়ার পছন্দ হয়েছিল। সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, জিয়া তাদের পদোন্নতির ব্যাপারে উৎসুক ছিলেন না। অ-মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দ্রুত পদোন্নতিপ্রদান এবং মন্ত্রিসভায় স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে স্থান দেওয়া ছিল জিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৮১ সালের মে মাসে বিদ্রোহ হওয়ার অন্যতম কারণ। জিয়া সেই বিদ্রোহে নিহত হন। বিদ্রোহের পেছনে এমন কারণ থাকার কথা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম (৩০ মে ২০২২)। জিয়াহত্যায় অভিযুক্ত সেনাকর্মকর্তারা বিদ্রোহপরবর্তী সামরিক আদালতে এই তথ্য দিয়েছেন।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের যুদ্ধাপরাধী পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া আরেক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও অব্যাহত রেখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি খন্দকার আবদুর রশিদ, সৈয়দ ফারুক রহমান ও বজলুল হুদা ১৯৮৭ সালে এরশাদের আমলেই ফ্রিডম পার্টি নামে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন। অর্থাৎ এরশাদই শেখ মুজিবের খুনিদেরকে বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। ফ্রিডম পার্টি পরিচালিত হতো লিবিয়ায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মার গাদ্দাফির অর্থায়নে। দল গঠন করার আগ পর্যন্ত এই খুনিদের একাংশ দেশছাড়া ছিলেন। এরশাদই তাদেরকে দেশে ফেরার সুযোগ করে দেন। ১৯৮৬ সালে এরশাদ সৈয়দ ফারুক রহমানকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও সুযোগ দেন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে মেহেরপুর থেকে বজলুল হুদা সাংসদও নির্বাচিত হন। অর্থাৎ শেখ মুজিবের খুনিরা এরশাদের আমলে জাতীয় সংসদেও চলে যায়। এরশাদও শেখ মুজিবের হত্যাকারীদেরকে বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে বহাল

রাখেন, কাউকে-কাউকে পদোন্নতিও দিয়েছেন। ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মান্নানকে এরশাদ মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসাশিক্ষক সমিতির সভাপতি হিশেবে মাদ্রাসাশিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মান্নান জেনারেল নিয়াজির সাথে দেখা করেন। নিয়াজিকে এক কপি কোরান উপহার দিয়ে মান্নান বলেছিলেন– 'পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমরা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' এই বৈঠকের পর মাদ্রাসাশিক্ষক ও ছাত্রদেরকে রেজাকার, আল-বদর ও আশ-শামসে অন্তর্ভুক্ত করে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মান্নান-সংক্রান্ত উল্লিখিত তথ্যের উৎস 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' বইয়ের পৃষ্ঠা ৮৮-৯০। ইতিহাসের বড় ট্রাজেডি হলো– শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদেরকে আশির দশকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল গঠন করার সুযোগ করে দেওয়া এরশাদকে ২০১৪ সালে মন্ত্রীপদমর্যাদায় নিজের 'বিশেষ দূত' হিশেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানেরই জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা।

১৯.

যা হোক, স্বাধীনতাবিরোধী পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ায় খন্দকার মোশতাক আহমেদ, জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেন সংসদীয় গণতন্ত্র চালুর পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়া– বিএনপিপ্রধান বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৯১ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামির প্রত্যক্ষ সমর্থনেই সরকার গঠন করেন। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি জামায়াতে ইসলামির সাথে জোটবদ্ধ হন এবং নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পুরস্কার হিশেবে জামায়াতকে দুটো মন্ত্রিত্ব দেন। মন্ত্রিত্ব পাওয়া দুজনই একাত্তরে আল-বদরের শীর্ষ নেতা ছিলেন, নৃশংসতায় যে আল-বদর ছিল ক্ষেত্রবিশেষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চেয়েও ভয়াবহ। খালেদা জিয়া জামায়াতের তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামীকে বানান কৃষিমন্ত্রী পরে (শিল্পমন্ত্রী), সেক্রেটারি জেনারেল আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে সমাজকল্যাণমন্ত্রী। যুদ্ধাপরাধের দায়ে নিজামী-মুজাহিদ দুজনেই পরবর্তীকালে অবশ্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীরা বিভিন্ন শাসনামলে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রী হয়েছেন। জিয়াউর রহমান, হুসেইন

মুহম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা– চারজনই যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো স্বাধীনতাবিরোধী দলকে খালেদা জিয়াই প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করেছেন। উল্লেখ্য, যুদ্ধাপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডভোগরত অবস্থায় ২০১৪ সালে মারা যাওয়া আবদুল আলিম ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিএনপির টিকেটে সাংসদ ছিলেন, জিয়াউর রহমানের আমলে প্রথমে ছিলেন পাটমন্ত্রী ও পরে যোগাযোগমন্ত্রী।

২০.

জিয়াউর রহমানের পাটমন্ত্রী ছিলেন আবদুর রহমান বিশ্বাস। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর খালেদা জিয়া প্রথমে তাকে জাতীয় সংসদের স্পিকার বানান, পরে বানান রাষ্ট্রপতি। একাত্তরে রহমান ছিলেন স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগের একাংশের বরিশাল জেলা কমিটির সহ-সভাপতি। রহমান প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন এবং একাত্তরের জুলাই মাসে শান্তি কমিটির সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। রাষ্ট্রপতি আইনানুগভাবে বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল আর জামায়াতে ইসলামির ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবির ছাড়া আর কোনো ছাত্রসংগঠন রহমানের মতো একজন স্বাধীনতাবিরোধীকে দেশের রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য হিশেবে মেনে নেয়নি। মিছিল-মিটিং করে ছাত্রসমাজ এর প্রতিবাদ করেছিল এবং পুলিশ ছাত্রদেরকে যথারীতি পিটিয়ে প্রতিবাদ ভণ্ডুল করে দিয়েছিল। এর পর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন নীরবে-নিভৃতে। ছাত্ররা আবারও বিক্ষোভ করতে পারে– এই আশঙ্কায় আবদুর রহমান বিশ্বাসের কর্মকাণ্ডের খবরাখবর গণমাধ্যমে খুব-একটা প্রচারিত হতো না।

২১.

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী চট্টগ্রামের একজন কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হেয় করে যত কথা একজীবনে বলেছেন, বাংলাদেশে

আর কেউ তা বলেছেন বলে মনে হয় না। দেশের সবচেয়ে দাম্ভিক ও উদ্ধত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তিনি। অশ্লীল কথাবার্তায়ও তার জুড়ি ছিল না। যুদ্ধাপরাধের দায়ে ২০১৫ সালে তার ফাঁসি কার্যকর হয়। সালাউদ্দিন জিয়াউর রহমানের আমলেও বিএনপির টিকেটে সাংসদ হয়েছেন, সাংসদ হয়েছেন খালেদা জিয়ার মনোনয়নেও। খালেদা তাকে নিজের সংসদবিষয়ক উপদেষ্টাও বানিয়েছিলেন। ২০০১ সালে সালাউদ্দিন গোঁ ধরেছিলেন ওআইসির মহাসচিব পদে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য। খালেদা তাতে সম্মতিও দিয়েছিলেন। কথিত আছে– ২০০ কোটি টাকা খরচ করে দেশ-বিদেশে তদবির করেও সালাউদ্দিনকে জেতানো যায়নি। উলটো মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশীদের শ্রমবাজারের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল; কারণ ওআইসির সেই নির্বাচনে মালয়েশিয়ারও প্রার্থী ছিল, বাংলাদেশ নিজেরা প্রার্থী না দিয়ে মালয়েশিয়ার প্রার্থীকে সমর্থন দিলে মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকত। যা হোক, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও একজন যুদ্ধাপরাধীকে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠাতে খালেদা জিয়া দ্বিধাবোধ করেননি। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওআইসির মহাসচিব হয়ে গেলে বিশ্বপরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতেন একজন যুদ্ধাপরাধী।

২২.

শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজম আদালতের রায়ে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পান ১৯৯৪ সালে, খালেদা জিয়ার আমলেই। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৪– পাকিস্তানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এই ষোলো বছর আজম বেআইনিভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করেন। ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর খবর আসে– গোলাম আজমকে জামায়াতে ইসলামির আমির ঘোষণা করা হয়েছে। একজন পাকিস্তানি নাগরিককে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি করা হলো– এর প্রতিবাদে জনবিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন শহিদজননী জাহানারা ইমাম। আজমকে জামায়াতে ইসলামির আমির ঘোষণার তিন সপ্তাহের মাথায় দেশের ১০১ বিশিষ্ট নাগরিকের সমন্বয়ে 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হয়,

জাহানারা ইমামকেই নির্মূল কমিটির প্রধান করা হয়। কমিটি ঘোষণা দেয়– (১৯৯২ সালের) ২৫ মার্চের মধ্যে সরকার গোলাম আজমের বিচার না করলে ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে (রেসকোর্স ময়দান) গণআদালত বসিয়ে আজমের বিচার করা হবে। জামায়াত-সমর্থিত বিএনপি সরকার, অনুমিতভাবেই, নির্মূল কমিটির মিছিল-মিটিংয়ে পুলিশ দিয়ে হামলা করে; সেই হামলায় খোদ জাহানারা ইমাম আহত হয়ে পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। যে শহিদদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশরাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল, একজন পাকিস্তানি নাগরিককে দেশের একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেই শহিদদেরই একজনের মাকে খালেদা জিয়ার আমলে আহত-লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। গণআদালত বসানোর অপরাধে তৎকালীন বিএনপি সরকার জাহানারা ইমামসহ চব্বিশজন বিশিষ্ট নাগরিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ-মামলা করে। রাষ্ট্রদ্রোহ-মামলা মাথায় নিয়েই জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সালে মিশিগানে মৃত্যুবরণ করেন। শারীরিক হামলার পর রাষ্ট্রদ্রোহ-মামলা ছিল জাহানারা ইমামের জন্য বিএনপির শেষ উপহার।

২৩.

আসিফ নওয়াজ জানজুয়া ১৯৭১ সালে পাক সেনাবাহিনীর মেজর ছিলেন। বাংলাদেশে পরিচালিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যায় তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ আছে (ব্যাপারটার নিশ্চয়তা যাচাই করতে পারিনি)। জানজুয়া পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হন এবং সেনাপ্রধান থাকাকালে ১৯৯৩ সালের ৮ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। অন্য দেশের সেনাপ্রধানের মৃত্যুতে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের শোকপ্রকাশের রেওয়াজ নেই। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রচলিত রেওয়াজ ভেঙে জানজুয়ার মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে শোকপ্রকাশ করেছেন। এই শোকপ্রকাশের খবর পরেরদিনের (৯ জানুয়ারি ১৯৯৩) জাতীয় পত্রিকাগুলোয় (যেমন– ইত্তেফাক, সংবাদ, অবজারভার) ছাপা হয়। আবার, যে জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর কাছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে, সেই অরোরার মৃত্যুর সময়েও (২০০৫ সাল) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

ছিলেন খালেদা জিয়াই। কিন্তু জেনারেল অরোরার মৃত্যুতে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিশেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বা ব্যক্তি হিশেবে অনানুষ্ঠানিকভাবে কোনো শোকপ্রকাশ করেননি। পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের মৃত্যুতে প্রটোকল ভেঙে প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ, অথচ মুক্তিযুদ্ধের মিত্রবাহিনীর মৃত্যুতে একই প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা– এর কারণ নিয়ে নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে।

২৪.

মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক কিছু না, সংখ্যায় সামান্য হেরফের হতেই পারে। তবে, এই প্রশ্ন যারা অদ্যাবধি তুলেছেন, রাজনৈতিক পরিচয় খতিয়ে দেখলে এটাও আবার সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়– এই প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের কারো উদ্দেশ্যই মহৎ না, প্রত্যেকেরই দুরভিসন্ধি আছে। মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা যত কম দেখানো যাবে; পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংসতা তত কম বলে প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের মাত্রা তত ক্ষীণ বলে পরিগণিত হবে, দেশীয় দোসররাও পাবে বিশাল দায়মুক্তি। বিএনপি-নেতারা বরাবরই আকারে-ইঙ্গিতে বলে থাকেন– মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ত্রিশ লাখ না, তিন লাখ। মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ত্রিশ লাখ হলে তাতে বিএনপির কোনো ক্ষতি নেই, তিন লাখ হলে তাতেও বিএনপির কোনো লাভ নেই। তিন লাখ হলে লাভ আছে পাকিস্তানের, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এ-দেশীয় দোসররা নয়-দশমাংশ দায়মুক্তি পেয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিএনপি ১৯৯১ সালে খোদ সংসদেই বিতর্ক তুলেছে, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে সেই বিতর্ককে ফের উসকে দিয়েছেন স্বয়ং খালেদা জিয়া। অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নিরপরাধ বা কম-অপরাধী প্রমাণ করার কোনো চেষ্টাই বিএনপি বাদ রাখেনি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, খালেদা জিয়ার প্রথম মন্ত্রিসভার পরিবেশ ও বনপ্রতিমন্ত্রী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আরেক কাঠি বেশি সরেস। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও আল-বদর বাহিনীর হাতে নিহত হওয়া বুদ্ধিজীবীদেরকে নিয়ে ২০১৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সাথে গয়েশ্বর বলেন– 'যারা পাকিস্তানের বেতন-ভাতা খাইছে, শেষদিন পর্যন্ত, তারা নির্বোধের মতো মারা গেল। আমাদের মতো নির্বোধেরা

প্রতিদিন তাদেরকে শহিদ বুদ্ধিজীবী হিশেবে ফুল দেয়। না গেলে আবার পাপ হয়। ওনারা যদি এত বুদ্ধিমান হন, তাহলে ১৪ তারিখ পর্যন্ত নিজের ঘরে থাকে কী করে, একটু বলেন তো। আর তা ছাড়া, নিজ-নিজ কর্মস্থলে প্রতিমাসে পাকিস্তানের বেতন খাইল, এটাও তো কথা বলা যায়, যায় না? তারা পাকিস্তান সরকারের বেতন খাইল, তারা হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা। আর যারা পালায়ে-পালায়ে না খেয়ে বেড়ালো, তারা হয়ে গেল রেজাকার। তাই না? যারা ২৫ মার্চ মারা গেছেন, তারা মারা গেছেন না জানার কারণে। আর যারা ১৪ ডিসেম্বর মারা গেছেন, তারা অজ্ঞতার কারণে মারা যাননি। তাঁরা জ্ঞাতসারে অবস্থান করছিলেন।' শহিদ বুদ্ধিজীবীদেরকে নিয়ে এসব উক্তি করা ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের না বিপক্ষের– তা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুক্তিযুদ্ধ ইশুতে বিএনপি-নেতারা সাধারণত এই ভাষায়ই কথা বলে থাকেন, পোষণও করেন প্রায় একই মানসিকতা। গয়েশ্বর রায়ের এই মন্তব্য সম্পর্কে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেন– 'গয়েশ্বর রায় পাকিস্তানিদের জবান ধার করে কথা বলেছেন। সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো মানুষ এ কথা বলতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষকেই কি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যেতে হতো? এ দেশের বুদ্ধিজীবীসমাজ এখানে থেকেই প্রতিরোধ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন, লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তারা পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেননি।'

২৫.

আবদুল কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শাহবাগে যে গণজাগরণ হয়েছিল, শুরু থেকেই বিএনপি এর সক্রিয় বিরোধিতা করে এবং গণজাগরণে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকে। খোদ খালেদা জিয়া তাদেরকে নষ্ট-ভ্রষ্ট ও ফ্যাসিস্ট বলে বিষোদ্গার করেন। বিএনপিপন্থি দৈনিক পত্রিকা 'আমার দেশ' গণজাগরণকে ধূলিসাৎ করার পাঁয়তারা নিয়ে নামে এবং সেই উদ্দেশ্যে অনেকটা সফলও হয়। 'আমার দেশ'-এর অব্যাহত কুৎসা আর ব্যক্তিগত আক্রমণে শাহবাগের তারুণ্য খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। গণজাগরণকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য বিএনপি-জামায়াত ২০১৩ সালের ৫ মে উগ্রবাদী সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'-কে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ডেকে এনে সমাবেশ করিয়েছিল এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছিল।

উল্লেখ্য হেফাজতের কোনো নেতা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি; ধর্মভিত্তিক যেসব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে হেফাজত গঠিত, সেসব দলও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে কোনো ভূমিকা পালন করেনি। পরবর্তীকালে কখনও আওয়ামি লিগ সরকার হেফাজতের সাথে আপস করেছে, আবার কখনও হেফাজত আওয়ামি লিগ সরকারের সাথে আপস করেছে। শেষ পর্যন্ত তরুণদের দাবি পূরণ যেমন হয়েছে, ইতিহাসে তেমনি লেখা থাকবে– বিএনপি ১৯৯২ সালের গণআদালতকেও গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ২০১৩ সালের গণজাগরণও। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের জন্য যা যা করা সম্ভব, ১৯৭৫ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিএনপি এর সবকিছুই করেছে।

২৬.

আরেকটা কম আলোচিত স্বাধীনতাবিরোধী ঘটনা খালেদা জিয়ার আমলে সংঘটিত হয়েছে। এককালে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের নাম ছিল এমএ হান্নান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। হান্নান একাত্তরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং আওয়ামি লিগের দাবি অনুযায়ী– তিনি চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম পাঠ করেন। সে হিশেবে তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। কিন্তু বিএনপির দাবি– স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান (যদিও জীবদ্দশায় জিয়া নিজেকে কখনোই স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করেননি)। স্বাধীনতার ঘোষণার কৃতিত্বের ভাগাভাগিতে এমএ হান্নান যেহেতু জিয়াউর রহমানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, সেহেতু ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন বিএনপি সরকার এমএ হান্নান বিমানবন্দরের নাম পালটে ফেলে। নতুন নাম রাখে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর। এখন দুটো ছাত্রাবাস থাকলেও তখন হান্নানের নামে বিমানবন্দর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বিমানবন্দর থেকে হান্নানের নাম মুছে দিয়ে বিএনপি হান্নানকে ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত করে দিতে চেয়েছিল।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান একজন 'বীরউত্তম' খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। দেশে ঝাঁকে-ঝাঁকে বীরউত্তম নেই। মাত্র আটষট্টিজন মুক্তিযোদ্ধা এই খেতাব পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারও। ১৯৭১ সালের ২৬ ও ২৭ মার্চ রেডিওতে যারা

শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন, জিয়া তাদেরও একজন। কিন্তু সেনাপ্রধান, প্রধান সামরিক আইনপ্রশাসক বা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানকে মেলানো কষ্টকর। একাত্তরে তিনি যে-দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তার পঁচাত্তরপরবর্তী কর্মকাণ্ড সেই দেশের মৌলিক আদর্শের সাথে কোনোক্রমেই সামঞ্জস্যপূর্ণ না। বিএনপিতে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন ছিলেন-আছেন, তেমনি ছিল যুদ্ধাপরাধীদেরও অবাধ আনাগোনা। বিএনপিতে থাকা মুক্তিযোদ্ধা নেতারাও অবশ্য যুদ্ধাপরাধীদের ভাষায়ই কথা বলেন। জিয়াউর রহমানকে ঘিরে যুদ্ধাপরাধীরা প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, পঁচাত্তরপরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতাবিরোধীদের আশাভরসার কেন্দ্রস্থল। মায়ের কোলে শিশু যেমন নিরাপদ, জিয়াও তেমনি স্বাধীনতাবিরোধীদের জন্য নিরাপদ ক্লাব বনে গিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতা করতে গিয়ে জিয়াউর রহমান কখন যে বাংলাদেশেরই বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন, তা হয়তো তিনি নিজেও টের পাননি। জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানও বাবা-মায়ের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। ২০১৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব লন্ডনের এক আলোচনাসভায় তারেক শেখ মুজিবকে খুনি, রেজাকার, পাকবন্ধু ও অবৈধ রাষ্ট্রপতি বলে আখ্যা দেন এবং মুজিবের মরণোত্তর বিচার হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদের বিচারবন্ধে প্রণীত দায়মুক্তি অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদন, মুজিবের খুনিদেরকে পুরস্কৃতকরণ, মুজিবকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা, দালাল আদেশ বাতিল, কারাবন্দি অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদেরকে ছেড়ে দেওয়া, যুদ্ধাপরাধীদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ ফিরিয়ে দেওয়া, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি উন্মুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের সংগঠনগুলোকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন, স্বাধীনতাবিরোধীদেরকে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী বানানো ও 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রদান, গোলাম আজমকে বাংলাদেশে আসার ভিসা দেওয়া এবং বেআইনিভাবে বছরের পর বছর দেশে থাকতে দেওয়া, সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল, 'জয় বাংলা'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'কেই আপন মনে করা– একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে এসব কর্মকাণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের। যুদ্ধাপরাধীদের সংগঠন

জামায়াতে ইসলামিকে ক্ষমতার অংশীদার করা, দুই শীর্ষ আল-বদর নেতাকে মন্ত্রিত্বপ্রদান, আরেক স্বাধীনতাবিরোধীকে স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি বানানো, কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীকে ওআইসির মহাসচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া এবং তাকে নিজের উপদেষ্টা বানানো, শহিদজননীর নামে রাষ্ট্রদ্রোহ-মামলা দায়ের, দেশের স্থপতির হত্যাকাণ্ডের দিন নিজের ভুয়া জন্মদিন পালন, মুক্তিযুদ্ধের শহিদসংখ্যা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্কের জন্মদান, শহিদ বুদ্ধিজীবীদেরককে নির্বোধ আখ্যা-দান, পাকবন্ধু আখ্যা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাওয়া– এসব কর্মকাণ্ডও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের কোনো দলের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বও পাঠকের। উল্লিখিত কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে বা তাদের দলকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বলে স্বীকৃতি দেওয়ার সুযোগ আছে কি না– সেই উপসংহার টানার দায়ও পাঠকের ওপরই বর্তায়।

সব লেখার উপসংহার যে লেখকই টানবেন, ইতিহাসের সব রায় লেখকই দেবেন– এমন না। কিছু উপসংহার পাঠককেও টানতে হয়, কিছু রায় পাঠককেও দিতে হয়।

আখতারুজ্জামান আজাদ
স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসনে
বিএনপি-আওয়ামি লিগ-জাতীয় পার্টির ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ বনাম স্বাধীনতাযুদ্ধ : দুরভিসন্ধির তিলনকশা

২৯ আগস্ট ২০২৩

'মুক্তিযুদ্ধ' আর 'স্বাধীনতাযুদ্ধ'– শব্দ দুটো পরপর উচ্চারণ করলে কোনো পার্থক্যই অনুভূত হওয়ার কথা না। 'জল' আর 'পানি' যেমন পরস্পরের শতভাগ সমার্থক, মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতাযুদ্ধকেও সে-রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই দুই শব্দকে পাশাপাশি রাখলে অর্থগতভাবে মানসপটে কোনো জটিলতা তৈরি হয় না, মস্তিষ্কে কোনো আঘাত লাগে না, উদ্রেক ঘটে না কোনো প্রশ্নের। কিন্তু শব্দদ্বয়ের মাঝে প্রগাঢ় পার্থক্য আছে, সুকৌশল রাজনীতি আছে, আছে ইতিহাস থেকে তেইশটা বছর মুছে দেওয়ার চাঞ্চল্যকর চেষ্টা।

'স্বাধীনতাসংগ্রাম' বলতে সাধারণত রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংঘটিত সংগ্রামকে বোঝায়। স্বাধীনতাসংগ্রাম সামরিকও হতে পারে, হতে পারে বেসামরিকও। এর সাথে সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক মুক্তি জড়িত নাও থাকতে পারে। একটা স্বাধীন সরকার থাকলেই গড়পড়তা হিশাবে ধরে নেওয়া যায় দেশটা স্বাধীন। স্বাধীনতার জন্য সামরিক যুদ্ধ আবশ্যক না। বিনা যুদ্ধে, আলোচনা করে, চুক্তি সই করেও একটা দেশ স্বাধীন হতে পারে। ১৯৪৭ সালের ১৫ ও ১৪ আগস্ট যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে না, চুক্তির মাধ্যমে; যদিও ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বেশকিছু সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যেমন– ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। ব্রিটিশরা 'সিপাহি বিদ্রোহ' বলে আখ্যা দিলেও ওটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ। চুক্তির মাধ্যমে দেশ কেবল স্বাধীনই হয় না, অন্য দেশের সাথে মিশে গিয়ে পরাধীনও হয়; যেমন– স্বাধীন দেশ সিকিম ১৯৫০ সালে চুক্তির মাধ্যমে ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে যায়। কখনও-কখনও গণভোটের মাধ্যমেও দেশ স্বাধীন হতে পারে। ১৭০৭ সাল পর্যন্ত স্কটল্যান্ড ছিল স্বাধীন। কিন্তু ঐ বছর স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ড একীভূত হয়ে 'গ্রেট ব্রিটেন' নাম ধারণ করে (সাথে আয়ারল্যান্ডও যুক্ত হওয়ার পর নাম হয় ইউনাইটেড

কিংডম)। একবিংশ শতাব্দীতে এসে স্কটল্যান্ডের জনগণের একাংশ স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইউনাইটেড কিংডম (যুক্তরাজ্য) স্কটল্যান্ডে গণভোটের আয়োজন করে। ভোটের ফলাফল– ৪৫ শতাংশ স্কটিশ মনে করেছে স্কটল্যান্ডের স্বাধীন হওয়ার প্রয়োজন আছে, ৫৫ শতাংশ মনে করেছে স্বাধীনতা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, স্কটল্যান্ড পরাধীনই থেকে গেছে। বৃহত্তর সিলেট ভারতের সাথে যাবে, নাকি পূর্ব পাকিস্তানের সাথে– এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও সিলেটে ১৯৪৭ সালের ৭ জুলাই গণভোট হয়েছিল। সিলেটবাসী তখন ভারতের পক্ষে গেলে এখন শ্রীমঙ্গল-বিছনাকান্দি-মাধবকুণ্ড যেতে ভিসা লাগত। এমন অনেক দেশ আছে– যারা স্বাধীন হওয়ার পরও পূর্বতন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে। যেমন– অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, কানাডার মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রে সরকারপ্রধান থাকলেও রাষ্ট্রপ্রধান নেই; এখনও এই রাষ্ট্রগুলো সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান মানে ব্রিটেনের রাজা বা রানিকে। এই দেশগুলো স্বাধীন, কিন্তু মুক্ত না। ইচ্ছে করেই তারা শতভাগ মুক্ত হচ্ছে না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতাসহ আরো বিভিন্ন রকমের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত; যেমন– সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে– স্বাধীনতাসংগ্রাম বা স্বাধীনতাযুদ্ধ সামরিকও হতে পারে, হতে পারে বেসামরিকও। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে সামরিক যুদ্ধ থাকবেই, থাকবে দখলদার শক্তির কবল থেকে নিজেদের ভূখণ্ডকে মুক্ত করার যুদ্ধ; সাথে থাকবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক-সহ আরো নানান রকম মুক্তির যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে আরো যেটা অবশ্যম্ভাবীভাবে থাকবে– তা হলো স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। থাকবে স্থায়ী বা অন্তত অস্থায়ী একটা সরকার। ফিলিস্তিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, নিজস্ব সরকার আছে, বিভিন্ন দেশে দূতাবাস আছে, বেশকিছু দেশের স্বীকৃতিও আছে। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র যুদ্ধ ইসরায়েলি দখলদার শক্তির কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার যুদ্ধ। ফিলিস্তিনের এই যুদ্ধটা মুক্তিযুদ্ধ। বেলুচিস্তানও সেই ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের কোনো শক্তিশালী নেতা নেই, স্থায়ী বা অস্থায়ী সরকার নেই, সংবিধান নেই। ফলে, বেলুচদের যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ বলা চলে না, তাদের যুদ্ধ

বড়জোর স্বাধীনতাযুদ্ধ। পাকিস্তানি দখলদার শক্তির কবল থেকে সর্বাত্মক সামরিক-বেসামরিক যুদ্ধে বাংলাদেশ মাত্র নয়মাসে মুক্ত হয়ে গেলেও ফিলিস্তিন বা বেলুচিস্তান তা পারছে না। ফিলিস্তিন-বেলুচিস্তান লড়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে, আর ক'বছর বাদে তাদের লড়াইয়ের শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে যাবে। বলা হয়ে থাকে– পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কবল থেকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মুক্ত হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুক্তির মাহাত্ম্য বোঝেনি, কয়েক প্রজন্ম ধরে দখলদার সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ নির্যাতন সহ্য করলে মুক্ত বাংলাদেশে কোনো স্বাধীনতাবিরোধী নব্য-রেজাকার থাকত না, কেউ একাত্তরকে 'গণ্ডগোলের বছর' মনে করত না।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। (অস্থায়ী) সরকার গঠন করেছে ১০ এপ্রিল, শপথ নিয়েছে ১৭ এপ্রিল। ১০ এপ্রিল যে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' প্রণীত হয়, সেটিই ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান; পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের আগ পর্যন্ত ঐ ঘোষণাপত্রকেই সংবিধান অনুযায়ী মানা হয়ে থাকে। স্বাধীনতা ঘোষণার আগ থেকেই বাংলাদেশের নির্দিষ্ট একটা পতাকাও ছিল। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ডাকসুর তৎকালীন ভিপি আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন, শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান ২৩ মার্চ। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ছিল না, পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ছিল ২৬ মার্চ থেকেই স্বাধীন। ২৬ বা ২৭ মার্চ থেকে বাংলাদেশভূখণ্ডে যে সশস্ত্র যুদ্ধটা হয়েছে; সে-যুদ্ধ স্বাধীনতার জন্য ছিল না, ছিল ইতোমধ্যেই স্বাধীন হওয়া দেশকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। ফলে, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতাদিবস না, বিজয়দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতাদিবস ১৬ ডিসেম্বর না, ২৬ মার্চ। একাত্তরের যুদ্ধকে 'স্বাধীনতাযুদ্ধ' বললে এর আইনানুগ অর্থ দাঁড়ায়– ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ড 'পূর্ব পাকিস্তান'ই ছিল, ১০ এপ্রিলের মুজিবনগর সরকার অবৈধ, অস্থায়ী সংবিধান অবৈধ; শেখ মুজিবুর রহমান,

তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রদ্রোহী।

বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবিধান অনুমোদিত হয় প্রথম বিজয়দিবসে, ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সেই সংবিধানের শুরুতেই, অর্থাৎ প্রস্তাবনায়, বলা হয়– 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।' কিন্তু ১৯৭৯ সালে সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী আনেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচারবন্ধে খন্দকার মোশতাক আহমেদের জারিকৃত 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ'-এর সাংবিধানিক স্বীকৃতি, দ্বাদশ অনুচ্ছেদ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা অপসারণ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, যুদ্ধাপরাধীদের ভোটাধিকার পুনর্বহাল-সহ জিয়াউর রহমান ঐ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে আরো একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন আনেন। এই পরিবর্তন খুব-একটা দৃশ্যমানও না, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহও। মনে হবে– জিয়া এখানে সেরেফ একটা প্রতিশব্দ প্রতিস্থাপন করেছেন, জাতিকে শব্দার্থ শিখিয়েছেন। কিন্তু এই সামান্য পরিবর্তনের প্রভাব অসামান্য, উদ্দেশ্যও সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর। আইনের ছাত্র না হলে এই পরিবর্তনের তর্জমা ধরতে পারা অত্যন্ত দুরূহ।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান শব্দগত যে পরিবর্তনটি সংবিধানে এনেছিলেন, তা হলো– উল্লিখিত প্রস্তাবনায় তিনি 'মুক্তি'র পরিবর্তে 'স্বাধীনতা' এবং 'সংগ্রাম'-এর পরিবর্তে 'যুদ্ধ' শব্দটা প্রতিস্থাপন করেছেন। তাতে পুরো বাক্যটা দাঁড়িয়েছিল– 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।' জিয়াউর রহমানের পরিবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায়– একাত্তরের যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতার জন্য, অথচ বাংলাদেশ (যুদ্ধের আগেই) ২৬ মার্চ থেকেই স্বাধীন। জিয়াউর রহমানের এই সংবিধান-মতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ড আসলে পূর্ব পাকিস্তানই ছিল, বাংলাদেশ ছিল না। এখানে শব্দের আরো দ্যোতনা ও যাতনা আছে।

‘ঐতিহাসিক যুদ্ধ’ বললে কেবল ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের সশস্ত্র যুদ্ধকে বোঝায়। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামটা শুধু ঐ নয়মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল না; তেইশ বছরের (১৯৪৭ থেকে ১৯৭১) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামও ছিল। সংবিধানে ‘ঐতিহাসিক সংগ্রাম’ না বলে ‘ঐতিহাসিক যুদ্ধ’ বললে ঐ তেইশ বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামটাকে বেঘোরে অস্বীকার করা হয়। অস্বীকার করা হয় ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন, ১৯৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, বাংলাকে ১৯৫৬-এর সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে অন্তর্ভুক্তকরণের আন্দোলন, ১৯৬২-এর শিক্ষা-আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্রমামলা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন কিংবা ১৯৭১-এর ৭ মার্চকে। সংবিধানে ‘ঐতিহাসিক যুদ্ধ’ কথাটা থাকার পরোক্ষ অর্থ দাঁড়ায়– নয়মাসের সামরিক যুদ্ধটা ভিনগ্রহ থেকে আচমকা আমদানি হয়েছে, এর আগের দুই যুগে আর কিছুই ঘটেনি, ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণার মাধ্যমে ‘ঐতিহাসিক যুদ্ধ’ শুরু হয়ে ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির সদলবল আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ‘ঐতিহাসিক যুদ্ধ’ শেষ হয়ে গেছে।

কোনো হঠাৎঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন বা শত্রুমুক্ত হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরির পেছনে ছিল লক্ষ মানুষের আকণ্ঠ আত্মত্যাগ, ছাত্রজনতার আপাদমস্তক আন্দোলন-সংগ্রাম, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কূটনৈতিক কলাকৌশল ও কারানির্যাতনভোগ, শিল্পী-সাহিত্যিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইসহ আরো অনেক কিছু। কিন্তু সামরিক শাসকদের কাছে ওসব মূল্যহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। সশস্ত্র যুদ্ধের অংশটুকুই তাদের কাছে স্বীকৃতিযোগ্য; যেহেতু কেবল ওটুকুর সাথেই তারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেন এবং কৃতিত্বের ভাগ নিতে পারেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামে যেহেতু সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সংশ্লেষ থাকে না, সেহেতু সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সংবিধান পালটে ‘মুক্তি’র পরিবর্তে ‘স্বাধীনতা’, ‘সংগ্রাম’-এর পরিবর্তে ‘যুদ্ধ’ সাঁটিয়েছেন। প্রস্তাবনার অঙ্গীকার-অংশে যে ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম’ কথাটা ছিল; জিয়া সেটাও বিদায় করেছেন, সাঁটিয়েছেন ‘জাতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম’। এখানে

অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' কোনো অবস্থায়ই সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ বা অন্য কোনোভাবে সংশোধন করা যাবে না। জিয়াউর রহমান এই সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন করেছেন।

মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাসংগ্রাম নিয়ে এতক্ষণ যে তত্ত্ব ও তথ্য হাজির করলাম, তা নির্বিষ। এবার বিষাক্ত অংশ শুরু করা যাক। এইটুকু লক্ষ করতে হবে গভীরতম মনোযোগের সাথে। এই হিশাব যারপরনাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫(১)-এ বলা হয়েছে– 'অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।' অর্থাৎ বাংলাদেশে, আজকের আইন দিয়ে গতকালের অপরাধের বিচার করা যাবে না, আজকের আইন দিয়ে বিচার করা যাবে আজকে সংঘটিত বা ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য অপরাধের। আরো খোলাসা করে বললে– অতীতে কেউ যদি এমন কোনো অপরাধ করে থাকে, যার বিচার করার মতো আইন তখন ছিল না; তা হলে নতুন করে আইন বানিয়ে তার সেই অতীত অপরাধের বিচার এখন আর করা যাবে না। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে ১৯৭১ সালে, যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য 'দালাল আদেশ' পাশ করা হয়েছে ১৯৭২ সালে। তা হলে দেখা যাচ্ছে– বাহাত্তরের নতুন আইন দিয়ে একাত্তরের পুরোনো অপরাধের বিচার করলে তা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে, সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রথমবারের মতো সংশোধনী এনে সংবিধানে ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়। সেখানে বলা হয়– গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধের বিচার-সংক্রান্ত কোনো আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেই আইন বাতিল না হয়ে বহাল থাকবে। অর্থাৎ নতুন আইন দিয়েও পুরোনো অপরাধের বিচার করা যাবে, যদি সেটা হয় যুদ্ধাপরাধ। কোনো নতুন আইন দিয়ে যদি

পুরোনো অপরাধেরও বিচার করা যায়, তা হলে বলা হয়ে থাকে– নতুন আইনটার ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা (রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট) আছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালে যে 'দালাল আদেশ' পাশ হয়, তা ছিল শুধু এ দেশীয় দালালদের বিচারের জন্য প্রণীত। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার মতো সুযোগ বা ক্ষমতা বাংলাদেশের ছিল না। নিজেদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিজেরাই করবে বলে পাকিস্তান তাদের যুদ্ধাপরাধীদেরকে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে আর বিচার করেনি। যা হোক, মুক্তিযুদ্ধকে যদি কোনোভাবে 'স্বাধীনতাযুদ্ধ' বলে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা যায় এবং আইনানুগ উপায়ে যদি কোনোভাবে প্রমাণ করা যায় যে, ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের সবাই পাকিস্তানের নাগরিক ছিল, বাংলাদেশের না; তা হলে ১৯৭২ সালের 'দালাল আদেশ'-এর মাধ্যমে এ দেশীয় দালালদের (রেজাকার, আল-বদর, আল-শামস, শান্তি কমিটি) বিচার করা যায় না, কেননা যুদ্ধাপরাধ সংঘটনকালে (২৬ মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর) এরা বাংলাদেশের নাগরিক ছিল না, ছিল পাকিস্তানের নাগরিক। 'দালাল আদেশ' বাংলাদেশ বাদে অন্য কোনো দেশের অপরাধীদের বিচারের ক্ষমতা রাখে না। ফলে, দালাল আদেশ বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশে প্রণীত অন্য কোনো আইন কোনো কাজেই আসবে না।

'দালাল আদেশ'-এর আওতায় সাঁইত্রিশ হাজারের বেশি অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী কারাগারে ছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ– সুনির্দিষ্টভাবে এই চার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত না-থাকা আসামিদের জন্য ১৯৭৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান 'সাধারণ ক্ষমা'ও ঘোষণা করেন। 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণার পরও এগারো হাজারের বেশি অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী কারাগারে ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সামরিক আদেশ-বলে জিয়াউর রহমান 'দালাল আদেশ' বাতিল করে দেন, এই আইনের অধীন বন্দিদেরকে কারামুক্ত করে দেন, এমনকি এই আইনে দণ্ডিতদেরকেও (৭৫২ জন) তিনি মুক্ত করে দেন। ভবিষ্যতে কেউ যাতে 'দালাল আদেশ' পুনরুজ্জীবিত করে এ দেশীয় দোসরদের বিচার করতে না পারে; সেজন্য জিয়াউর রহমানের আমলে (১৯৭৯ সালে) সংবিধানের প্রস্তাবনায়

মুক্তিসংগ্রামের জায়গায় ‘স্বাধীনতাসংগ্রাম’ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ‘অপরাধ সংঘটনকালে দালালরা বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন না’ মর্মে অজুহাত দেখিয়ে ফাঁকফোকর গলে কোনোভাবে সাজা এড়িয়ে যেতে পারে।

এবার আসা যাক বিষাক্ত অংশের চূড়ান্ত পর্বে। জিয়াউর রহমান ‘মুক্তিযুদ্ধ’-কে ‘স্বাধীনতাযুদ্ধ’ বানিয়েই ক্ষান্ত হননি। ১৯৮১ সালে তিনি অত্যন্ত অভাবনীয় একটা ঘোষণা দেন। তা হলো ২৬ মার্চ ‘স্বাধীনতাদিবস’ হিশেবে পালিত না হয়ে ‘জাতীয় দিবস’ নামে পালিত হবে এবং ১৬ ডিসেম্বর ‘বিজয়দিবস’ হিশেবে পালিত না হয়ে পালিত হবে ‘স্বাধীনতাদিবস’ হিশেবে। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো– এই ভূখণ্ডের লোকজন ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিক ছিল, ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দেশ পাকিস্তানই ছিল। এর ফলে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা, ১০ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারগঠন (মুজিবনগর সরকার) ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অস্থায়ী সংবিধান) প্রণয়ন, ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের শপথগ্রহণ অবৈধ হয়ে যায়; একাত্তরের যুদ্ধটা মুক্তিযুদ্ধ না হয়ে পরিণত হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে। ১৯৭২ সালে যে ‘দালাল আদেশ’ পাশ করা হয়েছিল; সেই আইন অনুযায়ী বিচার করা সম্ভব ছিল শুধু দেশীয় দালালদের, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের না। বাংলাদেশের ‘স্বাধীনতাদিবস’ যদি ১৬ ডিসেম্বর হয়, তা হলে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের সবাইকে পাকিস্তানের নাগরিক বলে গণ্য করতে হয়। সে হিশেবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ দালালরাও ছিল পাকিস্তানের নাগরিক। এর মানে দাঁড়ায়– ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য বাংলাদেশ কোনো আইনই তৈরি করতে পারবে না (যেহেতু বাংলাদেশের আইন দিয়ে পাকিস্তানিদের বিচার করা যায় না)। ভবিষ্যতেও যেন কেউ এ দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আইন তৈরি না পারে, জিয়াউর রহমান সেজন্য ‘স্বাধীনতাদিবস’ ২৬ মার্চের বদলে ‘১৬ ডিসেম্বর’ পালন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৮১ সালের মে মাসেই নিহত হওয়ায় জিয়া ১৬ ডিসেম্বর একবারও স্বাধীনতাদিবস পালন করে যেতে পারেননি। ঐ বছরের ২৬ মার্চ ‘জাতীয় দিবস’ পালন করায় তিনি ব্যাপক প্রতিবাদের মুখোমুখি হন এবং ঘোষণা দেন– পরের বছর থেকে ২৬ মার্চ ‘জাতীয় দিবস’ হিশেবে পালিত না হয়ে ‘স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’

হিশেবে পালিত হবে। এই তথ্য নিয়েছি সাবেক তথ্যপ্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের 'জেনারেল জিয়ার রাজত্ব' ও সাংবাদিক আবেদ খানের 'ষড়যন্ত্রের জালে বিপন্ন রাজনীতি' বই থেকে।

অর্থাৎ মুক্তিসংগ্রামের জায়গায় স্বাধীনতাসংগ্রাম বসানো বা মুক্তিযুদ্ধের জায়গায় স্বাধীনতাযুদ্ধ শব্দের ব্যবহার সাধারণ কোনো ঘটনা না। সাধারণ কেউ অজ্ঞতাবশত মুক্তিসংগ্রাম আর স্বাধীনতাসংগ্রামকে গুলিয়ে তাতে দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু অসাধারণ কেউ সংবিধান কেটে-ছিঁড়ে 'মুক্তিসংগ্রাম' উঠিয়ে নিয়ে 'স্বাধীনতাসংগ্রাম' বসিয়ে দিলে এই পরিবর্তনকে তুচ্ছ ভাবার কোনো অবকাশ নেই। এই পরিবর্তনের মধ্যে একটা বিশেষ 'সিগনেচার' আছে। সংবিধান কেউ শখের বশে পরিবর্তন করে না। এই সংবিধানব্যবচ্ছেদ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, বরং বিচারের হাত থেকে স্বাধীনতাবিরোধী দোসরদেরকে রক্ষাকবচ দেওয়ার একটা নিরবচ্ছিন্ন সুদূরপ্রসারী দুরভিসন্ধির তিল-নকশা। সহজে ধরা যায় না বলে এবং আপাতদৃষ্টিতে তিলপরিমাণ বিধায় নকশাটাকে নীলনকশা না বলে তিলনকশা বলে অভিহিত করলাম।

আখতারুজ্জামান আজাদ

জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৮৮ (বরগুনা)
পড়াশোনা : বরগুনা জিলা স্কুল, নটর ডেম কলেজ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আইন বিভাগ)

প্রকাশিত বই

শুদ্ধ হব, হবে? (২০১০)
পর্দা ছেঁড়ার স্পর্ধা (২০১১)
সামরিক কবি, বেসামরিক প্রেমিক (২০১২)
শূদ্র মুখে রুদ্র বচন (২০১২)
বিষময় বিস্ময় (২০১৩)
প্রিয়াঙ্গনে রণাঙ্গনে (২০১৪)
এবং ইয়াম্মি সিরিজ (২০১৪)
জনতার মাঝে নির্জনতা (২০১৫)
ইয়াম্মি সিরিজ রিটার্নস (২০১৬)
লক্ষ্য আমার পক্ষ নেওয়া (২০১৭)
গণকবিতাতন্ত্রী বাংলাদেশ (২০১৭)
উসকানিমূলক গল্প (২০১৮)
আপনি তখন কোথায় ছিলেন (২০১৮)
এই যে আমায় আগুন দ্যাখো (২০১৯)
এখন আপনি চুপ কেন (২০২০)
বড়দের ছোটগল্প (২০২০)
ভয়ের দেশে লয়ের দেশে (২০২১)
আওয়াজ এবার তোলো (২০২২)
রাষ্ট্রজুড়ে অন্ধকার চতুর্দিকে খন্দকার (২০২৩)

akhtaruzzamanazad.law@gmail.com